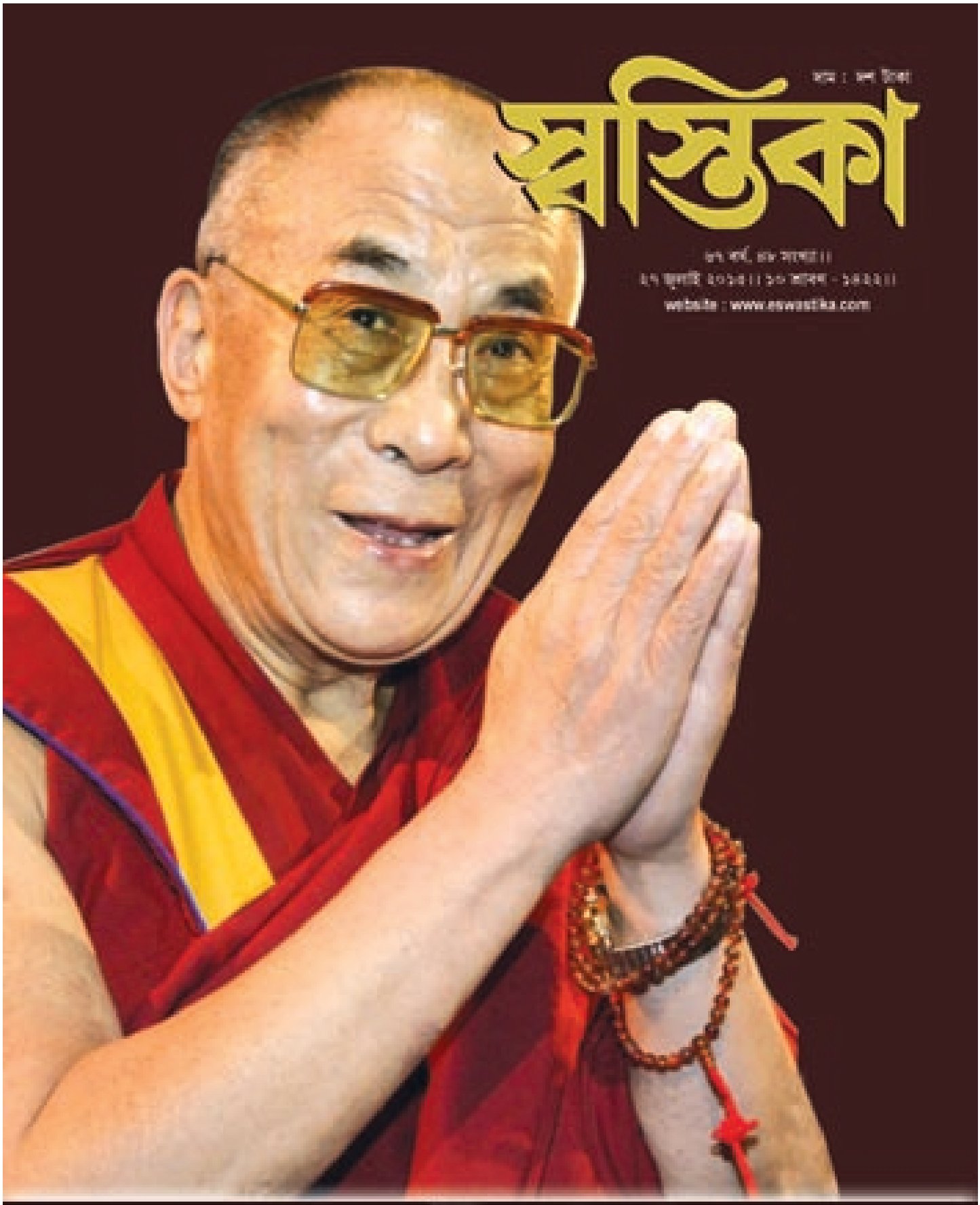

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা ।।
২৭ জুলাই ২০১৫ ।। ১০ শ্রাবণ - ১৪২২ ।।
website : www.eswastika.com

দলাই লামা

শান্তি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রবক্তা

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ১০ শ্রাবণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২৭ জুলাই - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

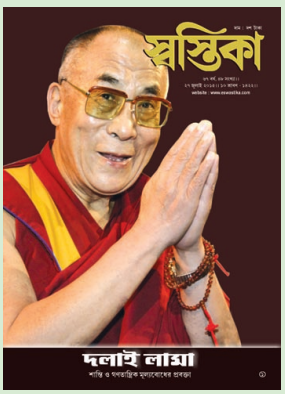

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

সরকারকে বুঝতে হবে পাকিস্তান ভারতের বন্ধু-রাষ্ট্র নয় ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : দিদির নীতি ফলো করুন মোদীজী.... ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ভারতের উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক পরিচয় কেউ জানে, কেউ জানে না ▯ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১২

ভারত গুরু, তিব্বত চ্যালা : দলাই লামা ▯ সারথি মিত্র ▯ ১৪

ব্রতবদ্ধ দলাই লামা ▯ ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৭

হিন্দুর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ ▯ শ্রীলেখা শ্রীবাস্তব ▯ ২০

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা ▯ প্রশান্ত চৌধুরী ▯ ২১

দলাই লামার জন্য এখনও নীরবে প্রার্থনা করে তিব্বত ▯ ২৭

যোগের নেপথ্যে যাঁরা... ▯ রিনি রায় ▯ ২৯

চার্চের দেশ বৃটেনে কমছে আস্তিক, বাড়ছে নাস্তিক ▯ মুজফ্‌ফর হোসেন ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫-৩৬** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮**▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪৯** ▯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

এরাজ্যে মানবাধিকার বিপন্ন

পশ্চিমবঙ্গে সাংবাদিক নিগ্রহ, ভোটদানে বাধা, পুলিশি নির্যাতন— এরকম একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। এমনকী মানবাধিকারের যাঁরা রক্ষক তাঁদের হয় শাসক গোষ্ঠীর বশংবদ হতে হবে, নয়তো নানা হেনস্থার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এককথায় রাজ্যে মানবাধিকার বিপন্ন। লিখেছেন **অম্লানকুসুম ঘোষ, দেবশ্রী চৌধুরী** প্রমুখ।

সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

বেটি বাঁচাও

মুসলমান ভোটের কাঙাল এই রাজ্যের তৃণমূল সরকার ইমাম মোল্লাদের কেবল মাসে মাসে ভাতা দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না, এখন রাজ্যে হিন্দুমেয়েদের শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ এবং লুঠ করিবারও অবাধ সুযোগ করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। যে ঘটনা পার্শ্ববর্তীদেশ বাংলাদেশে দিনের পর দিন ঘটিয়া থাকে, সেই একই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে এইবার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাংলাদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু বলিয়া তাহাদের নানারূপ অত্যাচার অনাচার মুখ বুঝিয়া সহ্য করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে এখন যাহা চলিতেছে তাহা বাংলাদেশেরই প্রতিচ্ছবি। রাজ্যের নানাস্থানে তৃণমূল দলের সহায়তায় মুসলমান দুষ্কৃতীরা মহিলাদের শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটাইতেছে। নিত্য সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে সেইসব সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। অপরাধীদের সহিত তৃণমূলদলের যোগ রহিয়াছে বলিয়া পুলিশ সবসময়ে নীরব হইয়া থাকে। রাজ্যের মালদহ, নদীয়া, বীরভূম এবং দুই ২৪ পরগনায় স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের মুসলমান দুষ্কৃতীরা নিত্যনৈতিক হামলা চালাইতেছে। কোথাও হাত ধরিয়া টানাটানি আবার কোথাও অ্যাসিড নিক্ষেপ। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে কু প্রস্তাব দিয়াছিল প্রতিবেশী সামেদ আলি। ছাত্রীটি সেই প্রস্তাব নাকচ করিয়া বাড়িতে তাহা বলিয়া দেওয়ায় ছাত্রীটিকে ধর্ষণ করিয়া কুলিক নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। সব থেকে বড় ঘটনা দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে ঘটিয়াছে। ১৪ বছর বয়সী দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে মুসলমান দুষ্কৃতীরা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই অপহরণে সারা বিশ্বে আলোচনা হইতেছে। জাতীয় মহিলা কমিশন তৎপর কিন্তু রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন অপরাধী মুসলমান জানিয়া ভোটের লোভে নিশ্চুপ। থানা পুলিশ, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আবেদন ইত্যাদিতে ফল না হইবার কারণে মেয়েকে ফেরত পাইতে অপহৃতার পিতা শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হইবার কারণে ঘটনার বিবরণ জানা যাইতেছে। অবশ্য নিত্য এমন বহু ঘটনা ঘটিতেছে যাহা অজানা রহিয়া যাইতেছে। ঘটনা ঘটিলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাহাকে 'সাজানো খবর', 'ছোটো ঘটনা' ইত্যাদি বলিয়া দায় এড়াইয়া গিয়াছেন। অপহরণের তত্ত্ব খারিজ করিয়া সম্প্রতি পুলিশ নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করে, 'ওই কিশোরী ফিরিয়া আসিয়াছে। সে আদৌ অপহৃত হয়নি, বাবা মারধর করিত বলিয়াই সে বাড়ি ছাড়ে।' বস্তুত জাতীয় মহিলা কমিশন এই রাজ্যে আসিতেই পুলিশের এই নাটকীয় সংলাপ। অথচ কিশোরীর বাড়ির লোকেরা জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রধান ললিতা কুমারমঙ্গলমের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন—'ওই কিশোরীকে আগেও একবার উদ্ধার করা হইয়াছিল। তখন দুটি শর্তে তাহারা মেয়েকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। এক, মুখে কুলুপ আঁটিতে হইবে এবং দুই, মেয়ের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা চলিবে না।' পরে ঘটনা জানাজানি হইতেই দ্বিতীয়বার অপহরণ করা হইয়াছে।

বস্তুত প্রশাসন এবং পুলিশের সহায়তায় মুসলমান তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা এই কাণ্ড করিয়াছে। অভিযুক্তদের মধ্যে প্রধান মগরাহাটের সেলিম ও বাবুগাজির কথা জানা গিয়াছে। আর পুলিশের সহায়তায় ইহা যে হইতেছে তাহাও উল্লেখ্য, না হইলে জাতীয় মহিলা কমিশন রাজ্যে হাজির হইতেই অপহৃত কিশোরীকে নবান্নে হাজির করিল কাহারা এবং ওই অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরীটি তিন মাস কোথায় ছিল ও তাহাকে পুলিশ প্রধানের অফিসে কাহারা পৌঁছাইয়া দিল সে উত্তর নাই কেন?

সুরাবর্দির রাজত্বের শেষ দিকে এই বঙ্গে একই ঘটনা ঘটিতেছিল। মুসলমান গুণ্ডারা সেদিনও পুলিশ এবং প্রশাসনের সহায়তায় হিন্দু মহিলাদের অপহরণ করিত। সেদিন বাংলার হিন্দু যুবকেরা এবং রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আজ মা বোনেদের সম্মান রক্ষায় হিন্দু যুবকদের তৃণমূলী মুসলমান দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহার পরও যখন রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী বড় মুখ করিয়া মেয়েদের উন্নয়নের গালগল্প বলিয়া বাজার মাত করিবার চেষ্টা করেন তখন তাহা ভণ্ডামি বলিয়াই মনে হয়।

সুভাষিতম্

গতে শোকো ন কর্তব্যো ভবিষ্যং নৈব চিন্তয়েৎ।
বর্তমানেন কালেন বর্তয়ন্তি বিচক্ষণাঃ।।

গত হওয়া সময়ের জন্য অনুতাপ করার প্রয়োজন নেই এবং ভবিষ্যতের জন্যও দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই।
বুদ্ধিমান লোক বর্তমানের জন্যই কাজ করে থাকেন।

মিসাইল নির্মাণে আত্মনির্ভর ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' সাকার হতে শুরু করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত 'আকাশ মিসাইল'। একে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থলসেনা ও বায়ুসেনার হাতে সমর্পণ করার কাজ ইতিমধ্যেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিক্কর করেছেন। তিনি গোয়ালিয়রের বায়ু সেনাধ্যক্ষ অরূপ রাহার হাতে প্রতীকাত্মক চাবি অর্পণ করেন। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধিকারী এই মিসাইল- যন্ত্রাংশের ৯২ ভাগ স্বদেশি টেকনোলজি দ্বারা করা হয়েছে। যন্ত্রাংশের প্রত্যেকটিতে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অঙ্কিত করা হয়েছে। এর আগে ব্যালেস্টিক মিসাইল অগ্নি-৫-এর নির্মাণে ৮৫ ভাগ স্বদেশি টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছিল।

আকাশ মিসাইল সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ দুইভাবেই করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞমহলের মতে, এর ফলে প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লগ্নি সার্থক প্রমাণিত হলো। এই অত্যাধুনিক মিসাইল তৈরি করেছে ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড। এই সুপারসোনিক মিসাইলের বৈশিষ্ট্য হলো সব মরশুমে বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যে ও একের অধিক লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম। ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত অব্যর্থ নিশানায় লক্ষ্যভেদ করতে পারে। আকাশেও সমান কার্যকরি। এর মারণ ক্ষমতা আকাশ-১ এর থেকে দ্বিগুণ। 'শ্যুট অ্যান্ড ফায়ার' সিস্টেমও এতে যুক্ত রয়েছে।

ভারতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহারে ক্ষেপণাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এখন পর্যন্ত দেশের কাছে ভূমি থেকে আকাশ এবং সমুদ্রের উপরিভাগে নিক্ষেপে সক্ষম মিসাইল-ই মজুত ছিল। তারপর তৈরি হলো অগ্নি-৫। এ এক অদ্ভুত ক্ষমতায় সড়ক অথবা রেলপথে শত্রুর ওপর আঘাত হানতে পারে। উপগ্রহও ঠাহর করতে পারবে না যে কোথা হতে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। ইউরোপ, সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ পর্যন্ত এর আওতার মধ্যে পড়ে। ভারতকে বারবার চোখ রাঙানো চীনের উত্তর প্রান্তের হার্বিন শহরও এর মারণ আওতার মধ্যে পড়ে।

প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে স্বদেশি কারিগরী বৃদ্ধির ভাবনা ১৯৮৩ সাল থেকে যোজনা হয়। সেই যোজনারই অন্তর্গত অগ্নি, পৃথ্বী, আকাশ এবং ত্রিশূল নির্মাণ করা হয়। ভারতে প্রথম পরমাণু পরীক্ষণের পর রাশিয়াও আর এল জি টেকনোলজি দেওয়া বন্ধ করে। কিন্তু এপিজে আবদুল কালামের প্রতিভা ও সতত সক্রিয়তার কারণে মিসাইল ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা বড় রকমের বেড়েছে। এজন্য বৈজ্ঞানিক তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে 'মিসাইল ম্যান' অর্থাৎ 'অগ্নিপুত্র' বলা হয়।

তাঁর অবসর গ্রহণের পর এই কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছেন মহিলা বৈজ্ঞানিক টিসি থমাস। অগ্নি-৫ গবেষণার নির্দেশক ছিলেন শ্রীমতী থমাস। ড. কালাম এবং শ্রীমতী থমাস ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' যোজনার দুইজন সার্থক রূপকার। এদের মৌলিক গবেষণায় আজ ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে চলেছে।

ওষুধের দাম বৃদ্ধিতে রাশ টানতে চলেছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভেষজ শিল্পের হাল ধরতে তৎপর হলো কেন্দ্রীয় সরকার। বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি ৩৯টির বেশি ওষুধের ওপর নতুন দাম বসাতে চলেছে। এর মধ্যে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক, মধুমেহ প্রতিরোধী ওষুধ যেমন রয়েছে তেমনি প্যারাসিটামল, ডিক্লোফিনাকের মতো অ্যানালজেসিস ওষুধও রয়েছে। বর্তমান বাজারে এই শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতার হার বেড়ে যাওয়ার কারণে ভেষজ সংস্থাগুলি নিজেদের মতো করে মূল্য নির্ধারণ করছে। আর এই বর্ধিত মূল্য ঝেড়ে ফেলতেই তৎপর হয়েছে সরকার। যদিও প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে ওষুধের দাম চক্রকারে যে হারে ছাপিয়ে যেতে বসেছে সেদিকেই আঙ্গুল তুলেছে। আবার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সেই সমস্ত সংস্থাগুলিকেই দায়ী করছে যারা নতুন ব্রান্ড চালু করে দাম নির্ধারণ করছে। উল্লেখ্য, ৬৫২টি অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম আয়ত্তের মধ্যে থাকলেও প্রতিটি ওষুধের ক্ষেত্রে বাজারে শেয়ার কমপক্ষে ১ শতাংশ হবে। তবে সরকার সমস্ত ওষুধের ক্ষেত্রেই বছরে ১০ শতাংশ বাড়াবার বৈধতা দিয়েছে। গত লোকসভা বাজেটে এ প্রসঙ্গে আলোচনাও হয়। তবে বর্তমানে মোট ৯৪ হাজার ভেষজ বাজারের মধ্যে ৩০ শতাংশ সরকারি নিয়ন্ত্রাধীন। তবে ৩৯টির বেশি অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম যে ক্রমশ ছাপিয়ে যেতে বসেছে তার রাশ টানতেই তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

কাশ্মীরে জঙ্গি সংগঠনগুলো স্থানীয় যুবকদের দলে টানছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের আদমসুমারি অনুসারে গত এক দশকের মধ্যে এই প্রথম কাশ্মীরের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে নিয়োজিত স্থানীয় তরুণদের সংখ্যা বিদেশি জঙ্গিদের ছাপিয়ে গেল। আদমসুমারি অনুযায়ী সাম্প্রতিকালে জঙ্গি সংগঠনে যুক্ত ১৪২ জনের মধ্যে ৮৮ জনই স্থানীয় ও বাকি ৬৪ জন বিদেশি বলাবাহুল্য বেশিরভাগই পাকিস্তানি। জঙ্গি নিয়োগের বাড়বাড়ন্ত সবথেকে বেশি দক্ষিণ কাশ্মীরে। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হিজাব-উল-মুজাহিদিন কর্তৃক নিয়োজিত ৬০ জনের মধ্যে সকলেই এই দক্ষিণ কাশ্মীরের বাসিন্দা। এই বিষয়টি থেকে স্পষ্ট জঙ্গিদের নতুন ঘাঁটি পুলওয়ামা জেলার টাউনশিপ ত্রালে যার দায়িত্বে রয়েছে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলার অন্যতম মুখ ২১ বছর বয়সী মুজফ্ফর ওয়ানি। প্রাপ্ত সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, গত ছয় মাসে দক্ষিণ কাশ্মীর থেকে ৪৪ জন যুবক নিখোঁজ হয়েছে যার মধ্যে ৩০ জনই জঙ্গি দলে যোগ দিয়েছে, বাকি ১২ জন ফিরে এসেছে এবং দু' জনের ব্যাপারে পুলিশের কাছে কোনো তথ্য নেই।

উত্তর কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। সম্প্রতি নিযুক্ত ৬৯ জন জঙ্গির মধ্যে ২৫ জনই স্থানীয়। বাকি ৪৪ জন বিদেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অঞ্চলে বিদেশি জঙ্গিদের আনাগোনা সব থেকে বেশি। এই এলাকায় তারা বেশ সক্রিয়। গত কয়েক মাসে ৩৮ জন যুবক নিখোঁজ হয়েছে। পরে অবশ্য ২৯ জনই ফিরে এসেছিল। মাত্র ৩ জন জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিয়েছিল এক্ষেত্রেও অবশিষ্ট ছ'জন পুরোপুরি বেপাত্তা হয়ে যায়।

শ্রীনগর, বুদগাস, গান্দেরবাল জেলায় অর্থাৎ সেন্ট্রাল কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলি স্থানীয় যুবকদের নিয়োগে তত বেশি সক্রিয় নয়। এই অঞ্চলে মাত্র ১৩ জন জঙ্গি সংগঠনের কাজ দেখভাল করলেও তারমধ্যে মাত্র ৩ জন স্থানীয়। একটি প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী গত এক বছরে এই অঞ্চল থেকেও অবশ্য নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

বর্তমানে জঙ্গিরা আর তাদের পুরাতন 'ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার'দের উপর বিশেষ আস্থা রাখতে পারছে না। তাই তারা নতুন প্রজন্মের সংবেদনশীল মুসলমান যুবকদের দলে টানতে উদ্যোগী হয়েছে। আর এভাবেই লস্কর-ই-তৈবাকে পিছনের সারিতে ফেলে দিয়ে এক নম্বর স্থানে উঠে এসেছে ভারতবর্ষের মাটিতে তৈরি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিজবুল মুজাহিদিন। হিজবুল আবার পূর্ণ উদ্যোগে তাদের নড়বড়ে সাংগঠনকে মজবুত বানাতে উঠে পড়ে লেগেছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থাগুলির ফোকাস তাদের উপর থেকে সরানোর লক্ষ্যেই সাম্প্রতিক অতীতে তারা তাদের জঙ্গি কার্যকলাপ কিছুদিনের জন্য বন্ধ রেখেছিল।

ঈদে কলকাতার বাজারে পাক-পোশাক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ঈদের উৎসবে কলকাতার মুসলমান মহিলাদের আরও বেশি পাকপ্রেমী করতে মহানগরীতে পা রেখেছে পাকিস্তানি ডিজাইনারদের তৈরি পোশাক। ভারতীয় মুসলমানদের পাক-প্রীতিকে মূলধন করে আইস স্কেটিং রিঙ্ক-এ আসিম জোফা, গুল আহমেদ খানা সাফিনাজ, জারা শাহ জাহানের মতো পাকিস্তানি ডিজাইনারদের ডিজাইন করা পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে তুলতে ভিড় জমাচ্ছে মুসলমান মহিলারা। তবে এই ঘটনাকে নিতান্ত উৎসবের মেজাজে না দেখে একটু অন্যভাবেও দেখা উচিত। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে নানান বৈচিত্র্য যেমন রয়েছে তেমনি পোশাকেও রঙবাহারি সাজ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পাকিস্তানের এই পোশাক ভারতীয়দের মধ্যে ঢুকিয়ে পাকিস্তানি প্রেম চাগিয়ে তোলার এক কৌশল। কারণ তারা ভালো করেই জানেন ঈদের পর আসতে চলেছে দুর্গোৎসব, আর তাতেও এই পোশাকের ক্রেজ বাড়ানো গেলে কাজটা আরও সহজ হয়ে উঠবে। সুতরাং পোশাকের মাধ্যমে এক অভিসন্ধি কাজ চলছে এ রাজ্যে।

ভারতের একটি টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারিত পাকিস্তানি ধারাবাহিক ধারাবাহিকগুলির কল্যাণে কলকাতা-সহ সারা দেশে 'পলোজো' প্যান্টের ক্রেজ বাড়ছে। কলকাতার মুসলমান মহিলারা ব্যস্ত হচ্ছেন পাক ধারাবাহিকের মহিলাদের অনুকরণে নিজেদের সাজাতে। আপাতদৃষ্টিতে এ এক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন বলে বোধ হলেও আগামী দিনে এই পথেই ভারতের অর্থনীতিতে আঘাত হানতে পারে পাক-উৎপাদিত দ্রব্য।

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street,
Kolkata - 700 016

M : 98311 85740, 98312 72657,

Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

কেরলের ৩৯ জন খৃষ্টান হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলো

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২১ ডিসেম্বরের পর কেরলে আরও একবার ধর্মান্তরিত হতে দেখা গেল ৩৯ জন খৃষ্টানকে। ১১টি ধর্মান্তরিত খৃষ্টান পরিবারকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। 'ঘরবাপসি' নামের এই কর্মসূচী সারা দেশ জুড়েই চলছে বলে জানিয়েছে ভি এইচ পি। তবে কেরলে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার।

গত ১৯ জুলাই কেরলের আলাপ্পুঝা জেলার চেরিয়ান্দু নামক স্থানের স্থানীয় নাল্লাভেটিল ভদ্রকালী মন্দিরে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'ঘরবাপসি' অর্থাৎ হিন্দুধর্মে ফেরানো হয়। সকাল ৬টা থেকে বেলা ১০টা অবধি চলা এই ঘরবাপসি অনুষ্ঠানে খৃষ্টানদের গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ এবং সেইসঙ্গে চলতে থাকে হোম-যজ্ঞও। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ভি এইচ পি এবং আর্য সমাজের কার্যকর্তারা। এ প্রসঙ্গে আলাপ্পুঝা জেলার ভিএইচপি প্রধান প্রতাপ জি পাড়িকল বলেন, 'আমরা আমাদের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। খুব শীঘ্রই অন্য ধর্মে চলে যাওয়া মানুষজনকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। যারা হিন্দুধর্মে বিশ্বাসের সঙ্গে ফিরে আসতে চায় তাঁদের পথ আরও সহজ করে তুলছি। উল্লেখ্য, ২১ ডিসেম্বর ২০১৪-তে কেরলের হরিপদ নামক স্থানে এরকম ৩০ জন খৃষ্টান হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। রাজ্য জুড়ে চলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই কর্মসূচিতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে রাজ্যের ইউডিএফ সরকার একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকার ৫ কোটি টাকার একটি তহবিল তৈরি করে তার তত্ত্বাবধানের জন্য কমিশন গঠন করেছে যাতে ধর্মান্তরিতদের 'ঘরে' ফিরিয়ে আনার কাজটা আরও সহজ হয়ে ওঠে।

অসমের হিন্দু বাঙালিরা আজও উদ্বাস্তু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বাধীনতার ৬৮ বছর কেটে গেলেও অসমের হিন্দু বাঙালিরা আজ পর্যন্ত বিদেশি নাগরিকের তকমা গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে ব্যর্থ। অসমের মাটিতে হিন্দুদের উপর অত্যাচার এখনও অব্যাহত। কিন্তু তারাও যে এখানকার নাগরিক সেই দাবি নিয়ে সোচ্চার হলো নিখিল ভারত বাঙালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতি। গত ১৮ জুন এই সংগঠনের অসম রাজ্য কমিটির দ্বিবার্ষিক অধিবেশনে নাগরিকত্বের দাবি নিয়ে সোচ্চার হতে দেখা যায় তাদের। মূলত এখানকার স্থানীয় হিন্দু বাঙালিদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার নতুন কিছু নয়। আর এ রাজ্যে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস সরকার তা আমল দিয়ে এসেছে।

জানা যায়, নাগরিকত্ব ইস্যুতে নোংরা রাজনীতি করে আসছে কংগ্রেস সরকার। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলে আদালত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পক্ষে রায় দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আদালতের রায়কে অগ্রাহ্য করে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়নি বলে জানা যায়। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে হিন্দু বাঙালিদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার জন্য বুদ্ধিজীবী ও সংগ্রামী চেতনার সংগঠনগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাঙালিদের দুর্বলতা ও নীরবতার জন্যই বিদেশি তকমা সেঁটে হয়রানি করা হচ্ছে বলে মনে করেন সংগঠনের উদ্যোক্তরা। নিখিল ভারত বাঙালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতির আক্ষেপ, হিন্দুস্তানে হিন্দুদের নাগরিকত্ব চাওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। এবার সেই দাবিকেই বাস্তবে রূপ দিতে অসমের রাস্তায় নেমেছে স্থানীয় এই হিন্দু বাঙালি সংগঠন। ভোটের রাজনীতি বন্ধ করতে তৎপর তারা।

আমেরিকায় মন্দির তৈরির সাইনবোর্ড পোড়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৪ জুলাই দিনের আলোয় আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনার একটি হিন্দু মন্দির তৈরির বিজ্ঞপ্তিসূচক সাইনবোর্ড আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই বোর্ডের ষাটটি জায়গা বন্দুকের গুলি মেরে ফুটো করে দেওয়া হয়েছে। এতে সেখানকার ভারতীয়রা আতঙ্কিত বোধ করছেন। এই সাইনবোর্ডটির অর্থমূল্য ২০০ ডলার।

নর্থ ক্যারেলিনার ওম্ হিন্দু সংগঠন সেখানে ৩৬০০ বর্গফুটের একখণ্ড জমিতে মন্দির তৈরির পরিকল্পনা করেছে। এজন্য তারা ৭.৬ একর জায়গাও কিনেছে। তাদের বক্তব্য, আমেরিকার নাগরিক হিসেবে এই ধরনের ঘৃণ্য কাজের বিরুদ্ধে তারা লড়াই চালিয়ে যাবে। তাদের অভিযোগ, মন্দির তৈরির সাইনবোর্ড পোড়ানোর পিছনে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে।

সবার প্রিয় ®
বিল্লদা
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

শ্রমিক-ধর্মঘট নিয়ে পুনরায় ভাবতে হবে : বিএমএস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৯ জুলাই সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রায় সওয়া ঘণ্টা ধরে তাঁদের দাবিদাওয়া মন দিয়ে শুনলেও নির্দিষ্ট কোনো আশ্বাস দেননি। শুধু বলেছেন, শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব পূরণ করতে অর্থমন্ত্রী জেটলির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি তৈরি করেছেন। এ ইউ টি ইউ সি-র সম্পাদক গুরুদাস দাশগুপ্ত ও সিটু নেতা তপন সেন ধর্মঘট থেকে সরে আসা হয়নি বলে জানালেও বিএমএসের সাধারণ সম্পাদক বৃজেশ উপাধ্যায় ধর্মঘট নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবনা-চিন্তা করা দরকার বলে জানিয়েছেন। শ্রী উপাধ্যায় বলেন, এটা একটা ইতিবাচক উদ্যোগ। স্বাধীনতার পর কোনো প্রধানমন্ত্রী এভাবে এগিয়ে আসেননি। আমরা মনে করি সেপ্টেম্বরে ডাকা ধর্মঘটের আগে আরও আলোচনা হওয়া দরকার। তাই আমাদের অপেক্ষা করাই ভালো। উল্লেখ্য, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বিএমএস) দেশের সব থেকে বড় শ্রমিক সংগঠন।শ্রমিক সংগঠনগুলি দশ দফা দাবি নিয়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রমিক আইন সংশোধন ও বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের বিরোধিতা। ইউনিয়নগুলির আরও দাবি, সারাদেশে মজদুরদের জন্য ন্যূনতম মাসিক মজুরি ১৫ হাজার টাকা করতে হবে। উল্লেখ্য, ২১ জুলাই থেকে শ্রম সম্মেলন শুরু হচ্ছে, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর যোগ দেওয়ার কথা।

শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ভারতীয় ঐতিহ্যের পেটেন্ট দাবি মার্কিন সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভেষজগুণে সমৃদ্ধ যে পণ্য ছিল একান্তভাবেই ভারতবর্ষের, তাকেই নিজেদের আবিষ্কার বলে দাবি করে পেটেন্ট চেয়ে বসেছে একটি নামি মার্কিন সংস্থা। সংস্থাটির নাম শোনেননি এমন লোক খুব কমই আছেন। সম্প্রতি কলগেট-পামোলিভ ভেষজগুণে সমৃদ্ধ যে মুখ ধোওয়ার প্রক্রিয়ার পেটেন্ট দাবি করেছে ইউরোপিয়ান পেটেন্ট অফিসে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতের বিখ্যাত গবেষণা সংস্থা কাউন্সিল অব্ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সি এস আই আর)। সি এস আই আর-এর ইনোভেশন প্রোটেকশান ইউনিট (আই পি ইউ) চরক সংহিতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দেখিয়েছে ওই মার্কিন কোম্পানিটি 'মাইরিস্টিকা ফ্রাগর‍্যান্টস' এবং সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিতে তৈরি মৌখিক উপাদান হিসেবে যা দেখিয়েছে তার অস্তিত্ব ভারতে সুপ্রাচীনকাল থেকেই ছিল। সুপ্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থ 'চরক সংহিতা'য় এটির ব্যবহার ছিল মূলত মুখমণ্ডলের কোনো রোগ সারাবার জন্য। আই পি ইউ-এর প্রধান অঞ্জনা বড়ুয়া জানিয়েছেন যে তাঁরা প্রথমে ইউরোপিয়ান পেটেন্ট অফিসের ওয়েবসাইট থেকে কলগেট পামোলিভ ভারতীয় ভেষজ থেকে তৈরি ওই মুখশুদ্ধিটির পেটেন্ট দাবি করছে এমনটা জানতে পারেন। তৎক্ষণাৎ সমস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ তুলে ধরে সি এস আই আর-এর 'ট্রাডিশানাল নলেজ ডিজিটাল লাইব্রেরি'-র (টি কে ডি এল) সাইটে বিষয়টি তুলে ধরেন তাঁরা। আই পি ইউ-এর একটা বড়ো কাজই হচ্ছে বিশ্বজুড়ে চলা এইসব প্রাকৃতিক জালিয়াতির ওপর নজরদারি করা। এধরনের প্রমাণ হাতে এলেই উপযুক্ত তথ্যসহকারে তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রাচীন জ্ঞানের ডিজিটাল গ্রন্থাগার টি কে ডি এল-কেই প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করা হয়। আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধ এবং যোগ— এই চারটি বিষয়ে ভারতীয় সুপ্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের সাড়ে তিনশো-রও বেশি বইয়ের সাহায্যে 'ট্রাডিশানাল নলেজ ডিজিটাল লাইব্রেরি' গড়ে তোলা হয়েছে। এখনও অবধি ভারত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পেটেন্ট অফিসে জমা পড়া ১,১৫৫টি পেটেন্টের দাবিকে চিহ্নিত করতে পেরেছে, যেগুলির মূলে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের পরম্পরা রয়েছে এবং এর মধ্যে গত বছরের অগাস্ট অবধি ১,১২০টি ক্ষেত্রে সাফল্য মিলেছে। যেখানে পেটেন্ট প্রত্যাহার বা বাতিল কিংবা মৃত বলে ঘোষণা অথবা দাবিটি সংশোধন করা হয়েছে।

সরকারকে বুঝতে হবে পাকিস্তান ভারতের বন্ধু-রাষ্ট্র নয়

১৮ জুলাই, শনিবার দেশ জুড়ে শান্তিতে রথযাত্রা এবং ঈদ উৎসব পালিত হলেও ভারত-বিরোধী শক্তি কাশ্মীরে অশান্তি ও হিংসার প্ররোচনা দিয়েছে। শনিবার শ্রীনগরে ঈদের জমায়েতে ইসলামিক স্টেটস-এর খুনি জঙ্গিরা তাদের সবুজ পতাকা নিয়ে নাচানাচি করেছে। জমায়েতে পাকিস্তানের পতাকাও দেখা গেছে। কাশ্মীর থেকে ভারতকে বিতাড়িত করার হুমকিও দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে মুফতির পিডিপি-র সঙ্গে বিজেপির জোট সরকার ক্ষমতায় আছে। তা সত্ত্বেও আই এস জঙ্গিরা সেখানে ঘাঁটি গেড়ে কিভাবে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে তা বোধবুদ্ধির অগম্য। গিলানির মুক্তির দাবিকে সামনে রেখে আই এস জঙ্গিরা জম্মু ও কাশ্মীরকে অশান্ত করার ষড়যন্ত্র করেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মদত দিচ্ছে পাকিস্তান। এই অভিযোগ যে কাল্পনিক নয় তা বোঝা যায় পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের প্রধান উপদেষ্টা সরতাজ আজিজের বক্তব্যে। সরতাজ বলেছেন কাশ্মীর প্রশ্নটি বাদ দিয়ে ভারতের সঙ্গে শান্তির বার্তালাপ হবে না। অথচ গত ১০ জুলাই রাশিয়ার উফায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে পাক প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর প্রশ্নটি বাদ দিয়ে আলোচনায় সম্মতি দিয়েছিলেন। তিনি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য মোদীকে ইসলামাবাদে আমন্ত্রণ জানান। পরে দেশে ফিরে নওয়াজ শরিফ তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যান। এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধানের আমন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য কিনা ভারত সরকারের ভেবে দেখা দরকার।

অমৃতসরের কাছে ভারত-পাক ওয়াঘা সীমান্তে বিএসএফের ঈদের শুভেচ্ছা-সহ মিষ্টি পাক রেঞ্জারসরা প্রত্যাখান করার ঘটনা নিয়ে মিডিয়ায় বিস্তর জলঘোলা করা হয়েছে। অথচ এই কু-নাটকের কোনো

গূঢ় পুরুষের

কলম

প্রয়োজন ছিল না। মোদী সরকারকে বুঝতে হবে যে পাকিস্তান ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র নয়। কোনোদিনই ছিল না। ভবিষ্যতেও থাকবে না। কারণ, ভারত বিরোধিতার মাধ্যমেই পাকিস্তানের জন্ম। নেহরুর আমল থেকে দীর্ঘ বহু বছর কংগ্রেস তোষণ নীতি অনুসরণ করে পাকিস্তানকে মিত্র রাষ্ট্র করতে চেয়েছিল। আখেরে লাভ কিছুই হয়নি। পাক আগ্রাসন রুখতে ভারতকে যুদ্ধে নামতে হয়। প্রতিটি যুদ্ধে পাক বাহিনীর পরাজয়ের পরেও পাকিস্তানের আগ্রাসী নীতির পরিবর্তন হয়নি। ওয়াঘায় ঈদের মিষ্টি হাতে বিএসএফের জওয়ানরা যখন শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তখন দু'বার পাক বাহিনী কাশ্মীরে অস্ত্রবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে গুলি বর্ষণ করছে। গুলিতে মোট ১১ জন গ্রামবাসী আহত হন। ভারতের পাল্টা জবাবে পাকিস্তানের ১৫ জন আহত হয়। এই নিয়ে জুলাই মাসের ১৮ তারিখ পর্যন্ত পাক বাহিনী মোট ১১ বার অস্ত্র বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। এরপরেও পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের আমন্ত্রণে পাকিস্তানে মোদীর শুভেচ্ছা সফরে যাওয়াটা সঠিক পদক্ষেপ হবে কি?

পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দু ও শিখরা সেখানে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য হন। হিন্দু পরিবারের মেয়েদের ধর্ষণ করাটা পাকিস্তানে অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না। আজ পর্যন্ত ধর্ষণের একটি ঘটনারও বিচার হয়নি। শিখদের চাষের জমি বাড়ি জবরদখলের বিষয়টি আকছার ঘটে পাকিস্তানে। পাকিস্তানের এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর বর্বর অত্যাচারের ঘটনা ঘটে চললেও মানবাধিকার কর্মীরা নীরব থাকেন। কেন? জবাব দিতে হবে ইউনাইটেড নেশনসের আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদেরও। দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানে ১২ শতাংশ হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন। সেখানে ২০১৫ সালে তাঁদের সংখ্যা মাত্র ১ শতাংশ। উল্টো দিকে, ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যা ১৬ শতাংশ থেকে বেড়ে এখন গড়ে ৩০ শতাংশ হয়েছে। এই বিষয়টি কি মানবাধিকার কর্মীদের অনুসন্ধানের আওতায় পড়ে না? ভারতের মানুষ শান্তিতে বাস করতে চায়। কিন্তু শান্তিপ্রিয়তাকে যদি দুর্বলতা বলে মনে করা হয় তবে তার যোগ্য জবাব দেওয়া উচিত। যোগ্য জবাব বলতে আমরা সরকারি বিবৃতি চাই না। প্রয়োজন কূটনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে সশস্ত্র জবাব। সৌহার্দ্য সফর তখনই সফল হবে যখন পাকিস্তানের নেতৃত্ব বুঝবে যে প্রয়োজনে ভারত অস্ত্র ধারণে সক্ষম। পরমাণু অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ভারতকে ব্ল্যাকমেল করার নীতি পাকিস্তানকে ছাড়তে হবে। ■

দিদির নীতি ফলো করুন মোদীজী...

মাননীয় নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার
৭ রেসকোর্স, নয়াদিল্লী

আপনি নতুন জমি নীতি চাইছেন। কিন্তু বিরোধীরা তা হতে দিতে রাজি নয়। কিন্তু কেন দেবে বলুন তো! দেশের একটা রাজনীতি বলেও তো জিনিস আছে নাকি! আমাদের দিদি তো বলেই দিয়েছেন ওসব হবে না। সরকার জমিটমির ব্যাপারে নাক গলাবে না। সরকারের জমি ব্যাঙ্ক আছে, তা দিয়ে যতটা পারেন শিল্প করুন। না হলে করতে হবে না। আর সরকার নাক না গলালেও তৃণমূল কংগ্রেস গলাবে না সেটা কিন্তু দিদি বলেননি। দলকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই তো এই সিদ্ধান্ত। আরে বাবা দল থাকলে তবে তো সরকার। তবে তো শিল্প। তাই শিল্পপতিরা জমি না পেলে স্থানীয় তৃণমূলনেতাদের ধরবেন। দালালির ব্যাপারে তাদের এক্সট্রা ট্রেনিং আছে। ওরা মাঝখানে থেকে সব করে দেবে। এই শর্তে রাজি না হলে আমাদের শিল্প চাই না। 'কেন্দ্রর বঞ্চনা' স্লোগান নিয়ে আমরা এই বেশ ভালো আছি।

একশোতম প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, শিল্পের জন্য এক ছটাক জমিও নেবে না রাজ্য। শিল্পপতিদেরই 'আদর করে' তা জোগাড় করতে হবে। আরও এক পা এগিয়ে দিদির থিওরিকে প্রাঞ্জল করে মুখ্যসচিব সঞ্জয় মিত্র জানিয়েছেন, খাস জমি থেকেও জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করা হবে না। তাঁদের স্বীকৃতি দিয়ে পুনর্বাসনের বিষয়টিতেই অগ্রাধিকার দেবে রাজ্য সরকার।

মুখ্যসচিব শিল্পপতিদের সামনে বসিয়ে বলেছেন, 'আপনাদেরই ইচ্ছুক জমিদাতা খুঁজে বের করতে হবে। অনিচ্ছুকদের কাছ থেকে জমি নিতে জোর খাটাতে হয়। আমরা বল প্রয়োগের বিরোধী। কাউকে জোর করতে পারব না। তাতে যদি শিল্প না-আসে, না-আসবে।' এনটিপিসি, কোল ইন্ডিয়ার মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকেও এই নীতি মেনে জমি 'দেওয়া হয়েছে' বলে তিনি জানিয়েছেন। সুতরাং এটাই এ রাজ্যের নীতি। শিল্পপতিরা গুজরাট বা অন্য রাজ্যে গেলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

মোদীজী আপনার সরকার রাজ্যগুলিকে ব্যবসার পরিবেশ সহজ করতে সরকারি নিয়ম-নীতি সরল করার নির্দেশ দিয়েছে। সেজন্যই 'রাজ্যে সহজে ব্যবসা করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি' নিয়ে আলোচনায় সঞ্জয় মিত্রের এহেন বক্তব্য শুনে শিল্পপতিদের বক্তব্য— একেই অজস্র জমি-মালিকের সঙ্গে কথা বলা ও বিস্তর দর কষাকষির জেরে জমি নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপর এখন খাস জমি পেতেও যদি জবরদখলকারীর পুনর্বাসনের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়, তবে এ রাজ্যে লগ্নি করতে আসবেন কোন শিল্পপতি? প্রশ্ন উঠছে, এর পর এই সুবিধার আশায় খাস জমিতে যদি জবরদখলকারীর ভিড় বাড়ে, সেই সমস্যা সামাল দিতে পারবে তো রাজ্য?

কিন্তু কিসের সমস্যা আমি তো বুঝছি না। সরকারের আসল সমস্যা এবং চাহিদা ভোট পাওয়া। হ্যাঁ সরকার মানে তৃণমূল কংগ্রেস। ব্যাস। সুতরাং জবরদখলকারী ভোটব্যাঙ্ক আগে, শিল্প পরে। কোনো জবরদখল তোলা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী তো বলেইছেন, ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে জবরদখলকারীদের সরাতে চান না তিনি।

অনেকের আশঙ্কা, জমি-জটের কারণে রাজ্যে একেই বিনিয়োগ বাড়ন্ত, তার ওপর শিল্পায়নে এ বার শেষ পেরেক হতে পারে খাস জমিতে জবরদখলকারীদের 'স্বীকৃতির' এই সিদ্ধান্ত। কারণ, খাস জমি কাকে দেওয়া হবে, সে সিদ্ধান্ত অবশ্যই রাজ্যের। কিন্তু সেখানে জবরদখলকারী প্রশ্রয় পেলে, শিল্প গড়ার জটিলতা বহু গুণ বাড়বে।

রাজ্য বলছে, শিল্পের জন্য জমির অভাব নেই। জমি-ব্যাঙ্কে তা যথেষ্ট পরিমাণে মজুত। লাল ফিতের ফাঁস এড়িয়ে রাজ্যে লগ্নির পথ সহজ করতে গত চার বছর ধরে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বাণিজ্য মহলের বক্তব্য, অনেক শিল্পপতিই জমি ব্যাঙ্কে খোঁজখবর করার পরে পিছিয়ে যাচ্ছেন। কারণ সে জমির যে অসমান আয়তন, তাতে বড় শিল্প দূরের কথা ছোট বা মাঝারি শিল্প গড়াও সম্ভব নয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার উদ্যোগে দিল্লীর নীতি আয়োগের বৈঠকে যেদিন রাজ্যগুলিকে আলাদা আলাদা জমি অধিগ্রহণ আইন তৈরি করতে দেওয়ার দাবি উঠল, সেদিনই রাজ্যের অবস্থান কী হবে, তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুঝিয়ে দিয়েছেন, শিল্পপতিরা যতই মুখ ফিরিয়ে থাকুন, শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ না করার জেদে অনড় থাকবেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, ''যাঁরা শিল্প করবেন, তাঁরা নিজেরা ভালবেসে, আদর করে জমি কিনে নিন। তার পরে আমাদের কাছে এলে আমরা তো ১৪ ওয়াইয়ের সুবিধা দেবই।'' তাঁর জমি-নীতিকেই গোটা দেশের মডেল করার দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মোদীজী আপনিও দিদির পরামর্শ ভেবে দেখতে পারেন।

এবার শেষ কথাটা বলি মোদীজী। আপনার যে জমি নীতি তা শিল্পবন্ধু হলে শিল্পে বাড়বাড়ন্ত হবে দেশ। আর ক্রেডিট যাবে আপনার অ্যাকাউন্টে। সুতরাং ২০১৯ এর আগে আপনাকে এমন সুযোগ কি দেওয়া যায়?

— **সুন্দর মৌলিক**

ভারতের উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক পরিচয় কেউ জানে, কেউ জানে না।

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

এ শুধু আমি নয়, আমার চারপাশে যাঁদের দেখি তাঁদের অনেকেরই এই নিয়ে ধোঁয়াশা অবস্থা। কেউ তা বলে ফেলেন আবার অনেকেই চুপচাপ থাকেন। আমরা অনেকেই নিশ্চিত ভাবে জানি না আমাদের দেশের সঠিক পরিচয় কী। ভারতের কি সত্যই কোনো উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক পরিচয় আছে? না কি ভারতের ইতিহাস শুধু পরাজয়ের এবং গ্লানির। আমরা স্থিরভাবে জানি না বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতের অবদান কতখানি। এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। ভারতবাসী হিসাবে নিজেদের সঠিক পরিচয় জানার ইচ্ছা কে পূরণ করবে?

ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ভক্তকবি সুরদাস নিজের মনকে এক কালো কম্বলের সঙ্গে তুলনা করে পদ রচনা করেছিলেন— "সুরদাস মন কারি কমরিয়া চঢ়ত ন দূজো রঙ"। অর্থাৎ সুরদাসের মন কালো কম্বল, (যাতে) চড়ে না দ্বিতীয় রঙ। তাঁর চিত্ত কৃষ্ণময় ছিল। এই উপমা দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সেই মনে অন্য কারও স্থান হওয়া সম্ভব ছিল না।

আমাদের চারপাশে আমরা শত শত লোক এমন দেখি যারা সত্য সত্যই এক একটি কালো কম্বলের মতো মন নিয়ে চলেছে অর্থাৎ কালি কমলিওয়ালা। তারা নিজেদের ভাবে, নিজেদের মতে এতটাই মগ্ন যে অন্য কোনো ভাব বা মত তাঁদের মনের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে এরা চিহ্নিত হয়ে আছে ধ্বংস, মৃত্যু ও অবক্ষয়ের দ্বিতীয় নাম হিসাবে। অতীতে যেমন ছিল বর্তমানেও তাদের তাণ্ডব অব্যাহত রয়েছে। আমাদের পড়শী দেশ আফগানিস্তান তাদের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ধ্বংসের মুখে পড়েছে সিরিয়া, ইরাক। সৌদি আরবেও তাদের ছায়া পড়তে শুরু করেছে। এ সকল দুষ্কৃতীদের অধিকাংশই বিদেশি হলেও দুঃখের বিষয় এদেশেরও বহু সন্তান এই ধ্বংসের কাজে যুক্ত। অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও তেমন আছে।

আমাদের দেশের আরও দু'ধরনের লোকের কথা এখানে বলা যায় যারা নিজ দেশ এবং দেশবাসী সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। প্রথম দলের মানুষ ভারত সম্পর্কে এক অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে। তারা বিশ্বাস করে সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভারত, যা একদা ভারতবর্ষ ছিল, জ্ঞানের জগতে, বিশ্বশান্তি ও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের পথপ্রদর্শক রূপে অতুলনীয় এক দেশ। তারা বিশ্বাস করে আর্য শব্দটি যা সভ্য, সজ্জন, পূজ্য, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন মানবগোষ্ঠীর সূচক এবং তা ভারতের আর্যাবর্তের অধিবাসীদের জন্যই সবাই ব্যবহার করত। তাদের স্থির বিশ্বাস আর্যরা ভারতীয়, আর্যসভ্যতা ভারতের সভ্যতা, আর্যদের সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় ভাষাগুলির জননী। তাদের মতে বেদ, উপনিষদ, গীতার মতো জ্ঞানের ভাণ্ডার ভারত ছাড়া আর কারও নেই, ভারতের ঋষি মনীষীরা যখন সংখ্যাতত্ত্ব, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, আয়ুর্বেদ, খ-বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূ বিদ্যা, শল্যচিকিৎসা, ব্রহ্মবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা-সহ আরও বহুবিধ জ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন তখন বিশ্বের বহু প্রান্তের মানুষই গুহামানবের পর্যায়ে ছিল। তারা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে রাম সত্য, রামায়ণ সত্য, রামসেতু সত্য, মহাভারত সত্য। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের কিছুটা রামায়ণ-মহাভারতে ধরে রাখা আছে।

এই মানুষগুলি নিজেদের বিশ্বাসে এতটাই দৃঢ় যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে, বিশ্ববাসীর কাছে সত্য বলে তাকে প্রমাণিত করতে নানা তথ্য- প্রমাণ সংগ্রহের কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে চলেছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সেসব তথ্যের বিশ্বস্ত রূপও দিচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি ব্যাস মহাভারতে বর্ণিত বহু ঘটনার বিবরণ তৎকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশের উল্লেখ করে তিথিসহ নির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আধুনিক গবেষকেরা Sky Map Pro 5, Planetaria Software, Red shift, Panchanga Software ইত্যাদির সাহায্যে নভোমণ্ডলে সেই ধরনের গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশ কতকাল আগে হয়েছিল তা নির্দিষ্টভাবে স্থির করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের মতে সরস্বতী নদীর উপত্যকায় কুরুক্ষেত্রের সেই যুদ্ধ হয়েছিল ৩০৬৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে। সেই সময়ের গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশ ব্যাসদেবের বর্ণনার সঙ্গে ঠিক মিলে যায়।

ঋক্‌বেদে বহু স্থানে সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে অথচ বর্তমানে সেই অঞ্চলে তেমন বর্ণনার কোনো নদী নেই। গবেষকেরা Satellite Imagery-র সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের সেই ভাগের মাটির আর্দ্রতার নির্ণায়ক রঙের tone দেখে ও মরুময় অঞ্চলে সারিবদ্ধ বৃক্ষের উপস্থিতির বিচার করে অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর প্রাচীন গতিপথ নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই গতিপথের বিভিন্ন স্থানে খনন করে বিভিন্ন গভীরতা থেকে তোলা tritium analysis ইত্যাদির দ্বারা ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের সহায়তায় প্রমাণিত করেছেন সেই জল ২০০০ থেকে ৪৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের।

এই সঙ্গেই উল্লেখ করা যায় ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে U.S.A.-র California State University-তে The Rise of Civilization in the Greater Indus and Saraswati Valley শীর্ষক এক সম্মেলন হয়। সেখানে উপস্থিত সেই ইউনিভার্সিটিরই জন্মসূত্রে ভারতীয় অধ্যাপক Prof. D.R.

Sardesai, পাকিস্তানের পেশোয়ার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. ঈশান আলি, হরপ্পা অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণায় নিযুক্ত Dr. Brian Hemphill, Prof. Jonathan Mark Kenoyer, Dr. Richard Meadow প্রমুখ-সহ অনেকে শেষ নিষ্কর্ষে পৌঁছন এই ভাবে যে আর্যজাতির আদিভূমি সিন্ধু-সরস্বতীর তীরেই ছিল। তাঁদের ভাষা ছিল বৈদিক সংস্কৃত এবং সংস্কৃত হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম পূর্ণ বিকশিত ভাষা। তাঁরা সকলে একযোগে ভারতে আর্য-আক্রমণ তত্ত্বকে শুধু খারিজই করেননি উপরন্তু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মত দিয়েছেন পৃথিবীর সব দেশের পাঠ্যপুস্তক থেকে সেই ভুল তথ্যকে বাদ দিতে হবে।

জার্মানরা নিজেদের প্রকৃত আর্য বলে ম্যাক্সমুলারকে সামনে রেখে দাবি জানালেও তাদের কাছে আর্যদের ভাষা সংস্কৃত নেই ও আর্যদের সাহিত্য সম্ভার স্বরূপ বেদ, উপনিষদাদিও কিছুই নেই। ক্যালিফোর্নিয়ার সম্মেলন তাদের সেই মিথ্যা দাবিকেও নস্যাৎ করে দিয়েছে। আর্যদের ভাষা, তাদের সাহিত্যকৃতি যে দেশ সযত্নে, সশ্রদ্ধায় ধারণ ও বহন করে আসছে সে দেশ ভারতবর্ষ। ক্যালিফোর্নিয়ার সমাবেশে ভারতের আর্যত্ব প্রতিষ্ঠা পেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও কতিপয় বিশিষ্ট ভারতবাসী যাদের মধ্যে আবার বাঙালিই প্রধান— তারা এখনও ঢক্কা নিনাদে ভারতের আর্যত্বের দাবিকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বলে প্রচার করে চলেছে।

ভারতের যোগাসন ও প্রাণায়ামকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর ১৭৭টি দেশের সমর্থন পেয়ে ইউ এন ও কর্তৃপক্ষ সর্বজন কল্যাণকর বলে মত দিয়েছে এবং ২১ জুন তারিখকে বিশ্ব যোগ দিবস হিসাবে পালন করেছে। এই ঘটনায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী ভারতীয়েরা আবার গেল গেল রব তুলে সোচ্চার হয়ে পড়েছেন।

আরেকদল হলেন কালি কমলিওয়ালা। তাদের মন কালো কম্বলের মতো অন্ধকার। ভারতকে তারা জানে একদা শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের লেখা পুস্তকের মাধ্যমে। সেসব বইয়ে যা লেখা নেই তা মিথ্যা তো বটেই, তা সঙ্কীর্ণতার ও সাম্প্রদায়িকতার রঙে রাঙানো। তাঁরা এসব তত্ত্বকে সভা সমিতি করে, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বক্তব্য রেখে অক্লান্তভাবে জানিয়ে চলেছেন ভারতের আর্যত্বের দাবি ভুল , সরস্বতী নদী কল্পকাহিনি; রামায়ণ-মহাভারতও কাহিনিমাত্র, রামসেতুর সঙ্গে রামের কোনো সম্পর্ক নেই, তাই তা ভেঙে জলপথ তৈরি করা উচিত। ছাত্রদের গীতা থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ্য করার ব্যাপারও তাঁদের মতের বিরোধী, কারণ তা সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা দুষ্ট। সংস্কৃত শেখার প্রয়োজনও তাঁরা দেখেন না, এতে শুধু সময় নষ্ট ভাবেন। পৃথিবীর বহু দেশ ভারতের বৌদ্ধিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নিজেরা সমৃদ্ধ হচ্ছে অথচ আমাদের দেশে তাকে অচ্ছুত করে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র এই সব বিশেষ মানুষগুলির জন্য। বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর ও ইন্টারনেট থেকে জানা যায় আমেরিকার নিউজার্সি রাজ্যের সেটন হল বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতার অংশবিশেষ সকল ছাত্রের জন্য অবশ্য পাঠ্য হিসাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এর দ্বারা যুবসমাজকে সহজে দায়িত্ববোধ ও সুস্থজীবনবোধ বিষয়ে শেখানো যাবে।

এর সঙ্গেই উল্লেখ করা যায় পশ্চিম লন্ডনের সেন্ট জেমস ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কুলের জুনিয়র বিভাগে সংস্কৃতের পঠনপাঠনকে আবশ্যিক করার ব্যাপারটি। পশ্চিম দুনিয়া প্রমাণ ছাড়া কোনো বিষয়কে গ্রাহ্য করে না। তারা প্রমাণ পেয়েছে সংস্কৃত শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করলে তার স্বরাঘাতের ফলে মুখগহ্বরের বিভিন্ন স্নায়ু কেন্দ্রে যে অভিঘাত উৎপন্ন হয় তা মানুষের বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করে। সংগণক বিজ্ঞান বা কমপিউটার সায়েন্স বলছে উন্নত ব্যাকরণের গুণে সংস্কৃত ভাষায় বিপুল সংখ্যায় নতুন শব্দ নির্মাণ করা সম্ভব এবং পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে সংস্কৃতই সর্বাপেক্ষা কমপিউটার ফ্রেন্ডলি বা সংগণক-বান্ধব ভাষা।

আমাদের দেশের শাসককুলের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাঁরা ভারতের মহানতায় বিশ্বাসী নন। এছাড়াও রয়েছেন বহু মানবাধিকার কর্মী ও সমাজসেবীরা। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সমাজের বহু বিদ্বজ্জন। ফলে জাতীয় নীতি গঠনে ভারতের আত্মিক ও বৌদ্ধিক বিষয়গুলি স্থান পায় না। এদের উচিত নিজেদের বক্তব্যকে প্রমাণ সহ উপস্থিত করা। গীতা এক সহজলভ্য পুস্তক। প্রমাণসহ উদ্ধৃত করে তাঁদের বলা উচিত তার কোন অংশ সঙ্কীর্ণ বা সাম্প্রদায়িক। যাঁরা নুনের পুতুল নন তাঁদের সমুদ্র মাপতে ভয় কী? তাঁরা মেপে বলুন না কোন্‌টা সাগর আর কোন্‌টা ডোবা। ভারতের প্রাণায়াম ও যোগাসন কীভাবে মানুষের ক্ষতি করবে তাও বলা উচিত। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে প্রমাণিত ভারতের প্রাচীন গৌরবগাথাগুলি কোন্ দোষে বর্জনীয় তাও তাঁদের জানানো উচিত।

এ এক মহাসন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। ভারতের ১২৫ কোটি অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৭০ কোটি মানুষের বয়স ৪০ বছরের নীচে। এই বিপুল যুবশক্তির কয়েক শতাংশও যদি আত্মগৌরবে বলীয়ান হয়ে, দেশের গৌরবের দীপিতে দীপ্ত হয়ে দেশমাতৃকার উন্নতিকল্পে এগিয়ে আসে তবে 'এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে?'

ভারতের সহস্রবর্ষাধিক পরাধীনতার সময়ে আমাদের ধনরত্ন বিদেশিদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে, আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি ধ্বংস হয়েছে, আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার স্বরূপ পুঁথি-পুস্তক লুণ্ঠিত ও পুস্তকাগারগুলি ভস্মীভূত হয়েছে। যার ফলে আজ শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন এই ভারতীয়দের উৎপত্তি। এঁরা সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে দেশগঠনের কাজে এগিয়ে আসবেন এই আশাই সবাই করছি। তবু মন থেকে শঙ্কা দূর হয় না। বারেবারেই মনে পড়ছে বহুদর্শী রাজা ভর্তৃহরির সেই উপলব্ধি যাতে তিনি বলেছিলেন—

''অজ্ঞঃ সুখামারাধ্যঃ সুখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ।

জ্ঞানলব দুর্বিদগ্ধং তং নরং ব্রহ্মাণি ন রঞ্জয়তি।।

অর্থাৎ অজ্ঞকে সহজেই প্রসন্ন করা যায়। বিশেষজ্ঞদের আরও সহজে প্রসন্ন করা যায়। কিন্তু জ্ঞানলব (লব=লেশমাত্র) দ্বারা যে দুর্বিদগ্ধ হয়ে আছে তাকে ব্রহ্মাও প্রসন্ন বা সন্তুষ্ট করতে পারেন না।

(লেখিকা অবসরপ্রাপ্তা অধ্যাপিকা)

ভারত গুরু, তিব্বত চ্যালা : দলাই লামা

সারথি মিত্র

দলাই লামার আশিতম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে 'ইন্ডিয়া টুডে' তাঁকে নিয়ে বিশেষ প্রচ্ছদ করেছে— 'Why China Still Fears this Monk'। তাতে দলাই লামার একটি সাক্ষাৎকারও প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনায় সেটিই মূল উপজীব্য। তাঁর জীবনের আশিটি বছরের মধ্যে ছাপান্ন বছরই কেটেছে ভারতে। আজ তাঁর অনুভূতি কী? এই প্রশ্নের উত্তরে দলাই লামা বলেছেন : ''এক অর্থে আমাকে উদ্বাস্তু বলা যেতেই পারে। আমি আমার মাতৃভূমি হারিয়েছি। সেই জন্য আমি দুঃখিতও। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে

হাজার বছরের বেশি সময় ধরে ভারত ও তিব্বতের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজ করছে। আমরা ভারতকে সবসময়ই আমাদের 'গুরু' বলে মানি। নালন্দা-ঘরানার একজন ছাত্র হিসেবে আমি নিজেকে মনে করি। আমি আমার প্রাকৃতিক ঘর হয়তো হারিয়েছি, কিন্তু আধ্যাত্মিক ঘর লাভ করেছি। স্বাধীন ভারতবর্ষ চেয়েছে বলেই আমার সামনে এর বহু আধ্যাত্মিক নেতা, পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ এসেছে।'' আর এই সূত্রেই তিনি নিজেকে আর 'উদ্বাস্তু' ভাবছেন না। বরং 'ভারত সরকারের সুদীর্ঘতম সময়ের অতিথি' হিসেবেই নিজেকে বিবেচনা করতে পছন্দ করছেন অশীতিপর এই বৌদ্ধ-সঙ্ঘ প্রধান।

কিন্তু কেন তিনি ভারত সরকারের সুদীর্ঘতম সময়ের অতিথি? আর তিনি তা হলেনই বা কীভাবে? ১৯৫০ সালে চীনের তিব্বত আক্রমণের পরে দলাই লামার কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের দাবি জানানো হয়। ১৯৫১ সালে তিনি চীনের সঙ্গে ১৭ দফা চুক্তিতে সই করেন। লাসা এবং বেজিং-এর মধ্যে ক্ষমতার বিভাজনকে কেন্দ্র করে চুক্তির ধারাগুলি তৈরি হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে তিনি বেজিং যান চেয়ারম্যান মাও জেং দং জাউ এনলাই এবং জেং জিয়াওপিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ১৯৫৬ সালে বুদ্ধদেবের জন্মের আড়াই হাজার বছর উপলক্ষে তিনি দিল্লি আসেন। কিন্তু এদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই সময় তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরত পাঠান। ১৯৫৯ সালে তিনি লাসা থেকে বিতাড়িত হন এবং ভারতে প্রবেশে বাধ্য হন। এবারে নেহরু তাঁকে সাদরে বরণ করেন। সেই থেকে দলাই লামা আজও হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালার কাছে ম্যাকলিওডগঞ্জের বাসিন্দা। ১৯৬৩ সালে তিনি তিব্বতের জন্য একটি খসড়া গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রস্তুত করেন। নির্বাসিত তিব্বত প্রশাসনের কর্মপদ্ধতির একটি রূপরেখা তাতে ছিল। ১৯৮৯ সালে শান্তির জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯০ সালে ভারত ও ৩৩টি অন্যান্য দেশে বসবাসকারী তিব্বতীরা এক ব্যক্তি এক ভোটকে ভিত্তি করে ১১ তম তিব্বত পরিষদের ৪৬ জন সদস্যকে নির্বাচিত করে। ২০০০ সালে করমাপা লামা তিব্বত থেকে পালিয়ে যান ও ধর্মশালায় আসেন। ২০১১ সালে করমাপা লামা তিব্বত-পরিষদকে বলেন যে তিনি এই সাময়িক ক্ষমতা আর নিজের করায়ত্ত করে রাখতে চান না। তিনি তা পরিত্যাগ করতে চান। এর ফলে চীনের কারসাজিতে দলাই লামাদের যে আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ গড়ে তোলা হয়েছিল তার অবসান হলো এবং সেই সঙ্গে তিব্বতীরাও দ্বৈত-ধর্মগুরু সত্তা থেকে মুক্তি পেল। এর ফলে দলাই লামার ধর্মীয় অস্তিত্ব ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নির্ভেজাল বলেও প্রমাণিত হলো।

এই বৌদ্ধ ধর্মগুরুকে এমন প্রশ্নও করা হয়েছিল যে আপনি কী চীন সরকারকে এই মর্মে আশ্বস্ত করতে চাইবেন যে তিব্বত চীন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না? এর প্রত্যুত্তরে দলাই লামা মন্তব্য করেন : ''আমি তাদের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতেই পারি,

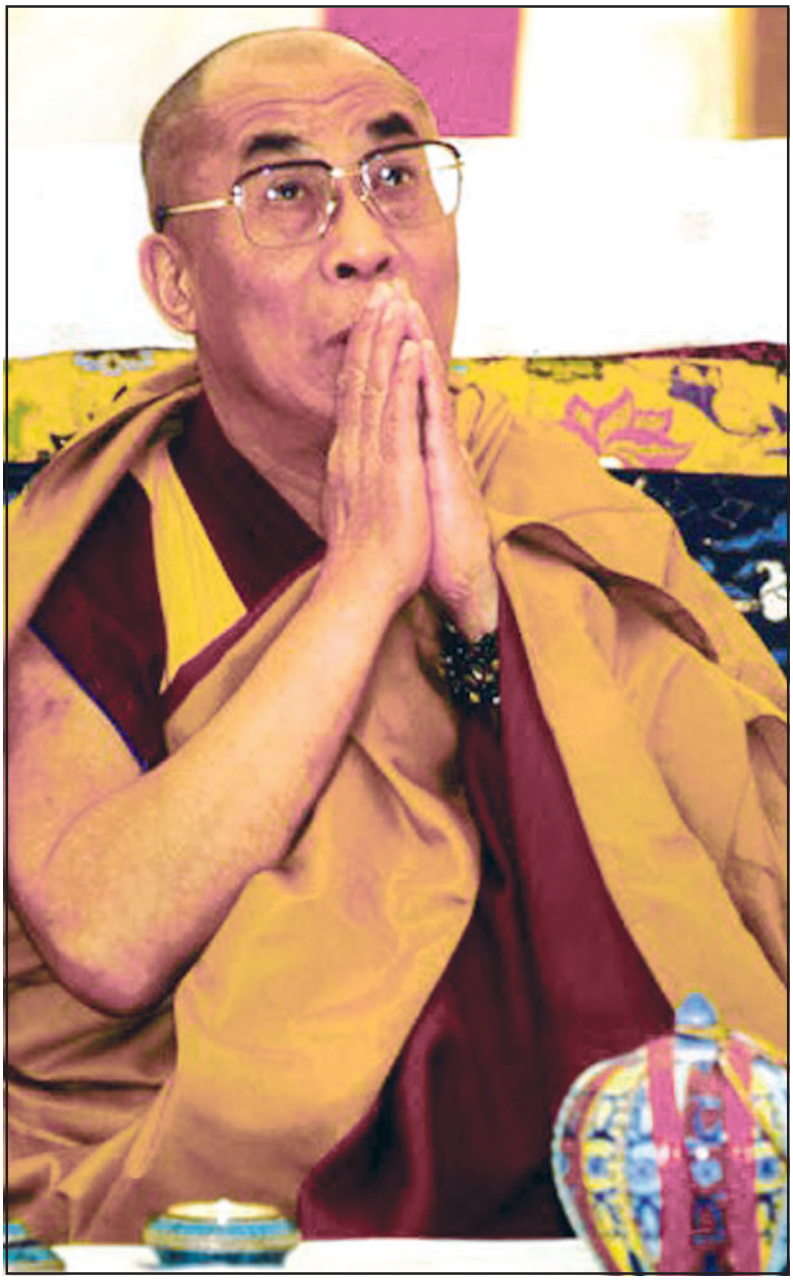

বিশেষ করে চরমপন্থীদের সঙ্গে। যাঁরা বাস্তবটা বুঝতে পারছেন না। তাঁরা তাদের জীবন ধরে একতরফা কিছু তথ্যেই বিশ্বাস করে এসেছেন। যে তথ্যগুলো যুগিয়েছেন চৈনিক ইতিহাসবিদেরা। সত্যিটা হলো সপ্তম কিংবা অষ্টম শতাব্দীতে তিনটি পৃথক সাম্রাজ্য ছিল— তিব্বতী, মঙ্গোলিয়ান এবং চৈনিক। কিন্তু সেটা অতীতে। আমি এক্ষেত্রে সবসময়ই ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা ভারতের মানসিকতার গুণগ্রাহী। ভারতে স্বাধীনতার আগে, অনেকগুলি ছোটো ছোটো রাজ্য ও রাজা ছিল। কিন্তু এখন সময় পরিবর্তিত হয়েছে। এটা একজন রাজার ক্ষেত্রে খুবই বোকামি হবে যদি তিনি বলেন আমি স্বাধীন, আমি সার্বভৌম রাষ্ট্র চাই ইত্যাদি। একইসঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে এও সত্য যে তিব্বত একটি পৃথক দেশ। একটা কথা বুঝতে হবে যে পিপল রিপাবলিক অব্ চায়নায় থাকতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের হাতে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সমৃদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং আমাদের পরিবেশ রক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। চীনেও বৌদ্ধধর্ম বাড়ছে, আজ ৪০ কোটি চীনা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন।”

দলাই লামার প্রতিনিধিরা এনিয়ে চীনের সঙ্গে বহুবার বৈঠকে বসেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি একটুও পাল্টায়নি, যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। কারণটা কী? দলাই লামা মনে করছেন : ‘‘চীন খুব ভালো করেই জানে আমরা সেই অর্থে স্বাধীনতা বা আলাদা হতে চাইছি না। কিন্তু অনেক চরমপন্থীই চান না আমি ফিরি। সেইজন্য তারা ক্রমাগত একটা ধারণা তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছে যে দলাই লামা বিচ্ছিন্নতাবাদী।

কোনো কোনো চীনা আধিকারিক তো আমাকে দৈত্য বলেও অভিহিত করেছেন। আমি মজা করে বলি, আমি শিং-ওলা দৈত্য। এই চরমপন্থীরা আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা তৈরির চেষ্টাও করেন যে আমিই নাকি যত গণ্ডগোলের মূলে এবং তাই আমাকে আটকানোর যাবতীয় অধিকার তাদের রয়েছে।”

দলাই লামা চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং-এর বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। জিনপিং-এর মা একজন নিষ্ঠাবতী বৌদ্ধও বটে। এই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বিস্ফোরক মন্তব্য করেন যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বহু সদস্য এবং সেনাবাহিনীর অনেক উচ্চপদস্থ আধিকারিকও মুখে নিজেদের নাস্তিক বললেও তারা বৌদ্ধধর্মে গভীর আস্থাবান। গত বছর ইউরোপ ও ভারত সফরে সময় জি জিনপিং প্রকাশ্যে বলেছিলেন, বৌদ্ধধর্ম হলো চীনা-সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গত বছর যখন চীনা প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং দিল্লী এসেছিলেন কিংবা তিনি যখন দক্ষিণ আমেরিকার টেক্সাসে ছিলেন

তখন হু জিনতাও গিয়েছিলেন ওয়াশিংটন সফরে। এই দুবারই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেও তিনি সফল হননি বলে জানান দলাই লামা। তিনি মনে করেন তিব্বত-কে অবদমিত করে নয়, একমাত্র উভয়পক্ষের আলাপ আলোচনাই পারে সমস্যার সমাধান করতে।

সমস্যার সমাধানে তিনি যে ভারতেরও মুখাপেক্ষী তা গোপন করেননি দলাই লামা। এদেশের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন : ‘‘ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সুদীর্ঘ সীমারেখা রয়েছে। সুতরাং তিব্বতের বিষয়টি ভারতের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সম্পর্কটাও স্বতন্ত্র। আমি অনেক সময় মজা করে বলি তিব্বত হলো ভারতের প্রতিরক্ষার প্রথম সারি। যতদিন তিব্বতের আধ্যাত্মিকতা থাকবে, ততদিন তিব্বতের সংস্কৃতিও রক্ষা পাবে। এক্ষেত্রে ভারত আমাদের গুরু, তিব্বত তার চ্যালা। তাই চ্যালা যখন কোনো সমস্যায় পড়ে, তখন গুরুরও দায়িত্ব থাকে তার থেকে তাকে উদ্ধার করা।’’

জওহরলাল নেহরুর আমল থেকেই তাঁর সঙ্গে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীদের অত্যন্ত সুসম্পর্ক। তবে নরেন্দ্র মোদীর ক্ষেত্রে একেবারে উচ্ছ্বসিত তিনি। নিজেই জানিয়েছেন মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন ওই রাজ্যে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের নমুনা মেলে, যেমন নালন্দা মন্দিরের মতো যেখানে সন্ন্যাসীরা থাকতেন। সেই সূত্রে গুজরাটে গিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। এমনকী মোদী তাঁর হোটেলের ঘরেও গিয়েছিলেন। দলাই লামার বক্তব্য ‘নরেন্দ্র মোদীকে দেখে সেদিনই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী হবার পর তাঁর কর্মদ্যোগ আরও বেড়েছে।’ প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকও হয়েছে। তবে গোপনীয়তার কারণে এব্যাপারে মুখ খুলতে চাননি তিনি।

দলাই লামা মনে করছেন ভারতে সামগ্রিক ভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রয়েছে। তবে একইসঙ্গে তাঁর মতে মুসলমানরা আতঙ্কিত বলে যে প্রচার চালানো হচ্ছে, সেটা আসলে ব্যক্তি-বিশেষের কায়েমি স্বার্থের রটনা। ■

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা
স্বস্তিকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা
অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম
—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—
২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬
দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

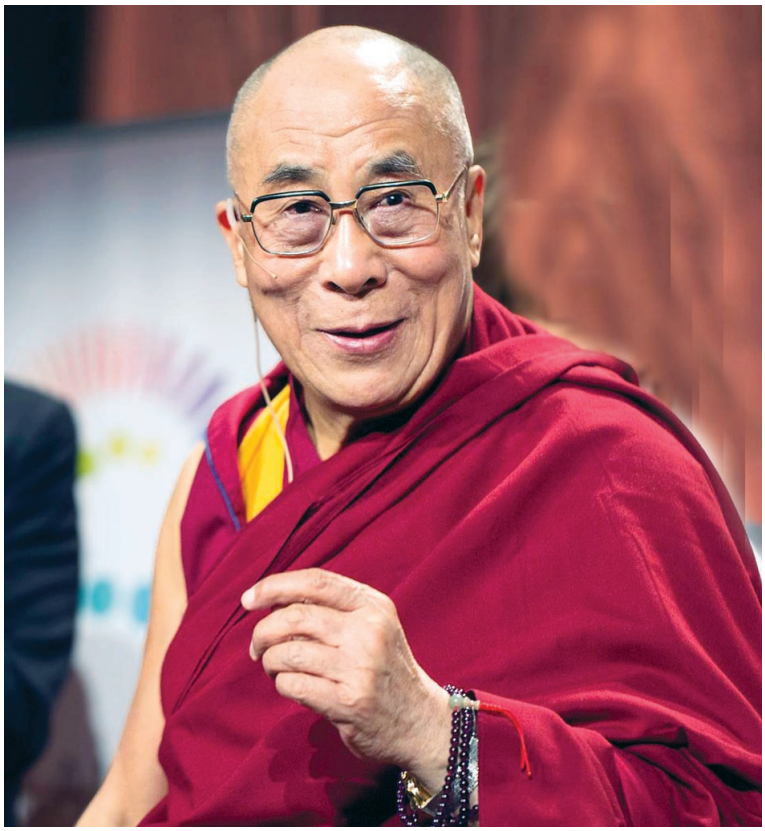

ব্রতবদ্ধ দলাই লামা

ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বৌদ্ধ ধর্মের রীতি অনুযায়ী কোনো নিয়তি নির্দিষ্ট ব্যক্তিই কেবল পুনর্জন্মের ফলে তিব্বতীদের প্রধান ধর্মগুরু বা পুজ্য অবতার হিসেবে মান্য হন। ঠিক যেমন যীশুখৃষ্টের জন্মমুহূর্তে পৃথিবীর দূর দূর প্রান্ত থেকে প্রাজ্ঞ পুরুষেরা তারার গতিপথ দেখে জেরুজালেমে এসে তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন। তেমনই ১৯৩১ সালে তিব্বতের লাসা থেকে ৪ সদস্যের এক অনুসন্ধানী দল আজকের দলাই লামার জন্মকালীন নিবাস তিব্বতের এক অজ পাহাড়ি গাঁয়ে এসে পৌঁছলেন। মাত্র ৪ বছরের 'লামো খণ্ডপকে' বৌদ্ধ শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের ধর্মগুরু ও নিয়ন্তার অর্থে 'দলাই লামা' (Dalai Lama) বলে গ্রহণ করেন। সেই বালক তখনই ১৪ তম দলাই লামা হিসেবে অভিষিক্ত হয়। এর ঠিক চার বছর আগেই ১৯৩৫ সালে ১৩ তম দলাই লামা লোকান্তরিত হয়েছেন। 'তাক্তসের' নামের অখ্যাত এই গ্রামের ছেলেটির নতুন নাম হয় 'তেনজিন গিয়াসটো' (Tenzin Gyasto)। ৬ বছর বয়স হতেই তাকে সিংহাসনে বসতে হয়। সেদিনের সেই বালকই আজ সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সম্মানিত শান্তিকামী নেতা দলাই লামা। নোবেল শান্তি পুরস্কার থেকে ম্যাগসাইসাই-এর মতো বিশ্বখ্যাত পুরস্কার ছাড়াও বিশ্বের তাবৎ খ্যাতনামা বিশ্ব বিদ্যালয়গুলির সাম্মানিক ডক্টরেটেও তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে।

সারা পৃথিবীর যে প্রান্তেই তিনি ভ্রমণ করেন বহু ক্ষেত্রেই নবীনতম রক সঙ্গীত গায়কের মতো জনপ্রিয়তা তাঁকে ঘিরে ধরে। তাঁর বক্তৃতার টিকিট কয়েক মাস আগেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। অনেক সময় তিলধারণের জায়গা না থাকা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 'অলিম্পিক্স'-এর স্টেডিয়ামগুলির দর্শকরা তাঁকে দেখতে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে যান।

তাঁর এমনটা হয়ে ওঠার বিপরীতে যে আগ্রাসী চীন চিরবৈরিতা নীতি জারি রেখেছে— তারা তীব্র ঈর্ষায় তাঁকে তকমা দিয়েছে 'a wolf in monk's garbs' —সন্ন্যাসীর বেশে এক ধূর্ত শেয়াল। এর ঐতিহাসিক কারণটি কখনই চীনের স্বপক্ষে যায় না। সেই ছোট্ট ৬ বছরের 'তেনজিন গিয়াসটো' নিজে জানতেই পারেনি মানুষের চাপিয়ে দেওয়া দেবত্ব ও শাসনাধিকার কখন তাঁর কৈশোর কেড়ে নিয়েছে। তাঁকে ধর্মতত্ত্ব পড়তে হয়েছে তার পিতৃসম সাধুদের সঙ্গে একাসনে বসে। সপ্তাহে একবার বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি ছিল। কিন্তু দেখা গেছে ইতিহাসে এমনই সব ধর্মগুরুরা যেমন পোপ, শঙ্করাচার্য বা খোমাইনি কেউই এত নবীন বয়সে এমন গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা পাননি। পরবর্তী সময়ে তাঁকে যে বিশাল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও শাসনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় কোনোক্রমেই ইংল্যান্ডের রানী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা আমেরিকান রাষ্ট্রপতির চেয়ে তা কম নয়। কিন্তু তিনি যে নিঃসঙ্গ পরিবেশে বড় হয়ে উঠতে বাধ্য হন সেখানে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ রাখার নিয়ম ছিল না। আধুনিক শিক্ষার কোনো আলোতেই ছিল না তাঁর অধিকার। সেদিনের তিব্বত ছিল একটি পুরোপুরি ধর্মীয় (Theocratic) শাসন প্রণালীর দেশ।

ভাবলে অবাক হতে হয় ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের সময় প্রায় ১২ বছরের কাছাকাছি বয়সে তিনি দু'জন পলাতক অস্ট্রিয়ান সৈন্যের মাধ্যমে ইংরেজির সংস্পর্শে আসেন।

একদিকে ধর্মগুরু ও অন্যদিকে রাজসিংহাসনের অধিকারী হওয়ার প্রবল টানাপোড়েন তখনকার তিব্বতী প্রাসাদ চক্রান্তের মধ্যে সদা বহমান থাকত। এই নবীন দলাই লামার আগে অন্তত ৬ জন ধর্মগুরু তথা শাসকের সিংহাসনের দাবিদার ৩০ বছর পূর্ণ হবার আগেই চক্রান্তে খুন হয়ে যান। তাই তাঁর বেঁচে থাকাটাও ছিল আশ্চর্যের। তবে এর একটি ভালো দিকও ছিল। পুনর্জন্মবাদ অনুযায়ী চিহ্নিত ব্যক্তিই যে শাসনভার পাবে এই প্রথা চালু থাকায় কোনো একটি মাত্র পরিবারের মধ্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে যাওয়ার

সম্ভাবনা থাকত না। অন্যদিকে একজন ধর্মগুরু নিযুক্ত হওয়ার পাশাপাশি একজন রাজপুরুষও ক্ষমতার অলিন্দে থাকতেন, ফলে এক ধরনের ভারসাম্য বজায় থাকত।

তিব্বতের শাসন প্রণালীতে একসঙ্গে দু'জনের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হলেও বাস্তবে দেখা গেছে দেশের বড় রকমের কোনো সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে দায়িত্ব গিয়ে পড়েছে দলাই লামার ওপর। যেমন ১৯৫০ সালের এক অপরাহ্নে লাসায় Radio Telegram এসে পৌঁছল চীনারা আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। সেই রাজপুরুষেরা (দলাই লামা অর্থে ধর্মগুরুরা নয়) তখন পিকনিক করছিলেন, তাই তাঁদের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে অপেক্ষা করা হলো। হায়! রাজপুরুষেরা টেলিগ্রাম পড়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, ১৫ বছরের দলাই লামার ওপর দায়িত্ব দিয়ে বললেন তিনি যেন একজন চীনপন্থী গভর্নর নিযুক্ত করেন, যে চীনা ভাষা জানে। ফলে চীনকে আক্রমণ থেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিরত করবে। তাঁদেরই নির্দিষ্ট করা ব্যক্তি 'নাগাপো' এই দায়িত্ব পেলেন। সেই বছরেই তিনি চীনের হাতে তাঁর সেনাবাহিনী সমর্পণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি শহরও চীনের অধিকারে চলে গেল। বাকি তিব্বত দখল করার হুঙ্কার ছাড়ল বেজিং। রাজপুরুষরা জ্যোতিষীর পরামর্শে তিব্বতের সমস্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কিশোর দলাই লামার উপর ন্যস্ত করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এই থেকে বোঝা যায় কী অসীম দূরদর্শিতা ও অসাধারণ প্রতিভা বলে সমগ্র প্রশাসনিক কাজকর্ম তাঁকে নিজের চেষ্টায় শিখতে হয়েছে। ইতিমধ্যে ভাগ্যের পরিহাসে যেহেতু তিনি তখনও সাবালক হননি সেই 'নাগাপো'র ওপরই অপদার্থ রাজপুরুষেরা ফের চীনের সঙ্গে দৌত্যের ভার দিলেন। পরিণামে নির্দিষ্ট জায়গায় সই করে ১৯৫১ সালে তিব্বত চীনের দখলে চলে গেল। চীন এই কাগজটিকে '১৭ পয়েন্ট চুক্তি' বলে প্রচার করে ঘোষণা করল যে তিব্বত 'মহান মাতৃভূমি চীনে ফিরে এল'। পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রনেতা কোনো প্রতিবাদ না করে নীরব দর্শক হয়ে রইলেন। দলাই লামার শেষ ভরসা ছিল মাও জে দঙ-এর ওপর, যে চুক্তি অনুযায়ী তিনি অন্তত স্বায়ত্তশাসনের

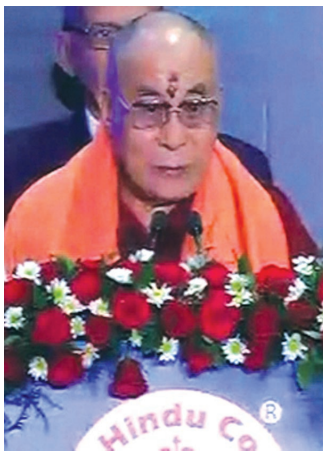

বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। বিশ্বের একাত্মতা জাগরণের ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দু মূল্যবোধগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একাত্মতার অভাব ও আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে বিশ্ব আজ যুদ্ধ, হিংসা, সন্ত্রাসবাদের মতো সমস্যার সম্মুখীন। বিশ্বে শান্তি রক্ষার জন্য ভারত তার অহিংসার দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান ও ধর্মের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি স্থাপনে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

—দলাই লামা
দিল্লীতে ২০১৪ খৃঃ ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেসে ভাষণ থেকে উদ্ধৃত

অধিকারটুকুতে ছাড় দেবেন যাতে সংস্কৃতি বা শাসনপ্রতিষ্ঠানটি বিনষ্ট না হয়।

কিন্তু ১৯৫৯ সালে ৮০ হাজার তিব্বতীকে খুন করল চীনের পিপলস লিবারেশন বাহিনী। প্রাণ বাঁচাতে ভারতের চলে আসা ছাড়া দলাই লামার কোনো বিকল্প ছিল না। ভারতের মাটি থেকেই তিনি প্রকাশ করতে শুরু করলেন তাঁর প্রশাসনিক কুশলতা।

ভারতে ও বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া তিব্বতী উদ্বাস্তুদের নিয়ে গড়ে তুললেন মজবুত সংগঠন। তৈরি হলো ধর্মশালায় Central Tibetan Administration ও Government in Exile, যার রয়েছে একটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক সংবিধান। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ১২টি দেশে যেমন ইউ এস এ, ইউ কে, সুইজারল্যান্ড, সাউথ আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই সংবিধানের আইন মেনে প্রতিনিধিরা রয়েছেন যাঁরা প্রায় বিদেশে প্রতিষ্ঠিত তিব্বত সরকারের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করে চলেছেন।

বিশ্বব্যাপী তিব্বতের স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার মূলে কাজ করছে দলাই লামার বিপুল জনপ্রিয়তা। পরিণতিতে বিশ্বের বহু সংসদে তিব্বতী মানুষদের স্বপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। যে সব দেশনেতা এ যাবৎ চীনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপের ভয়ে মৌন থেকে দলাই লামার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতেন না তারাও এখন এগিয়ে আসছেন। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বিশ্ব ব্যাঙ্ক চীনের পশ্চিমদিকে মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, তার্কিস্তান প্রভৃতি কলোনিকে (আরও গ্রাস করার উদ্দেশ্যে) উন্নত করার জন্য যে অর্থ সাহায্য চেয়েছিল তা মঞ্জুর করেনি। তাঁর এই নিরলস প্রয়াস বড় ধাক্কা দিয়েছে ধূর্ত চীনকে। গত ৬ বছর ধরে চালানো আলোচনা হঠাৎ ভেস্তে গিয়েছে। আলোচনার ছলে তিব্বতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার প্রক্রিয়া চালিয়ে তারা লাসা অবধি রেললাইন, রাস্তা সব তৈরি করে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে ৮০ বছরে পৌঁছন দলাই লামা। তাঁর মৃত্যু হলেই চীন নিষ্কণ্টক হবে বলে মনে করছে। এই মতলবের আঁচ অনেক আগেই পাওয়ায় দলাই লামা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তিব্বতবাসীকে তাঁর পরবর্তী নেতা নির্বাচনের ব্যবস্থা করার বিধান দিয়েছেন যাতে আগ্রাসী চীন তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই তিব্বতের আন্দোলন ধূলিসাৎ না করে দিতে পারে। ■

চিঠিপত্র

দুষ্কৃতীদের আড়াল করার চেষ্টা

অপরাধীদের আড়াল করা এই রাজ্যের শাসক দলের একটি অলিখিত বিধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই তার নেপথ্যে আছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরেই ভবানীপুর থানায় গিয়ে দলবল নিয়ে একদল মদ্যপ হামলাকারীকে ছাড়িয়ে আনেন। তখনই ধারণা করা গিয়েছিল যে তাঁর আমলে রাজধর্ম কেমন পালন হবে। পার্কস্ট্রিটে ধর্ষণ, কামদুনিতে ধর্ষণ ও হত্যা, বীরভূমের তৃণমূলকর্মী শেখ কানুর হুমকি— এরকম একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে। পুলিশের খাতায় ফেরার দাগি আসামি দিনদুপুরে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এবিপি আনন্দের চিত্র সাংবাদিক রাজর্ষি দত্ত গুপ্তকে হুমকি দিয়ে বলেছে যে আমি আপনাদের হাত পা কেটে নেবো কেউ কিছু করতে পারবে না, কারণ আমি তৃণমূল করি। এই সংবাদের অডিও ভিজুয়াল টেলিকাস্ট দেখে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এটা মিডিয়ার বানানো ঘটনা। বর্ধমানের খাগড়াগড়ের পর মেদিনীপুরের পিংলায় বোমা ও বিস্ফোরক তৈরির কারখানাকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ওটা নাকি বাজির কারখানা। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী নির্যাতিতাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। সাত্তরের ওই গৃহবধূকে পুলিশ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে অকথ্য নির্যাতন করে এবং নির্যাতিতা যাতে মুখ খুলতে না পারে তাই নির্যাতিতার বাড়িতে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁকে বিস্ফোরক আইনে গ্রেপ্তার করেছে। নির্যাতিতার পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের প্রতিটি পদক্ষেপ পুলিশ ভিডিওগ্রাফি কেন করত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে তিনি মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। গত ৮ জুন রাতে হরিদেবপুর থানার অল্প দূরে পুলিশ কিয়স্কের পাশে অবৈধ একটি পানশালায় গণ্ডগোল হয়, তার ফলস্বরূপ প্রকাশ্য রাস্তায় পুলিশের সামনে জনা ১৫-২০ দুষ্কৃতী গুলিবৃষ্টি করতে থাকে। পুরো ঘটনায় পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয়। গুলিবৃষ্টির মধ্যে পড়ে মারা যান রাহুল মজুমদার নামে এক ব্যক্তি এবং আহত হন আরও দুই ব্যক্তি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান এটি দুই গোষ্ঠীর এলাকা দখলের লড়াই। জানি না মুখ্যমন্ত্রী হয়তো কিছু একটা বলবেন। এটাই এখন পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক অবস্থা। খবরে বলছে, কলকাতাতে তিন মাসে ৯ বার গোলাগুলি চলেছে। দিদি আপনি কী সত্যি সত্যি আইনকে আইনের পথে চলতে দিচ্ছেন? আপনার আশীর্বাদ ধন্য ক্যাডারগণ অন্যায় করেও কী ছাড় পেয়ে যাচ্ছে না? জানি না আপনার বিবেক কবে জাগ্রত হবে? কবে আপনি তৃণমূলের চশমা খুলে মুখ্যমন্ত্রীর চশমা দিয়ে দেখবেন পশ্চিমবঙ্গকে? আপনাকে আমরা তৃণমূল সুপ্রিমো হিসেবে নয়, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই।

—সমর কুমার বোস,
চাকদহ, নদীয়া।

সংবাদ পরিক্রমা

এখনকার বিশেষ বিশেষ খবর—

(১) মমতা ব্যানার্জির ভ্রাতুষ্পুত্র অভিষেক বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, চোখ ছিঁড়ে ও হাত কেটে রাস্তায় ফেলে দেব। (২) সকলকে পাশ করিয়ে দেবার অজুহাতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কর্তৃক আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর। (৩) গতবার রাস্তায় গাড়ি আটকানোর জন্য পুলিশকে চড় এবং এবারেও পুলিশকে বলেছেন মেরে দাঁত ভেঙে দেব--- বলেছেন সাংসদ দোলা সেন, ম্যাডামের স্নেহধন্যা। (৪) রানীগঞ্জের তৃণমূল ছাত্রপরিষদের ব্লক সভাপতি সৌমিত্র বন্দোপাধ্যায় বোমা মেরে থানা উড়িয়ে দেবেন বলেছেন। (৫) দমদম পানশালায় অস্ত্রশস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার তিন তৃণমূলকর্মী। (৬) প্রশাসনিক চাপে পি.জি. অধিকর্তা প্রদীপ মিত্র'র স্বেচ্ছাবসর। (৭) গোষ্ঠী সংঘর্ষ মোকাবিলা করতে পুলিশকে কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। (৮) রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ নেই— প্রধান বিচারপতি। (৯) ভাঙরে বাজার নিলাম নিয়ে দুই তৃণমূল নেতার হাতাহাতি। (১০) দলভারি করতে প্রতিপক্ষ বামেদেরই হাত ধরল তৃণমূল। (১১) পুলিশকে তৃণমূলের অপরাধীদের পেটাতে বলল— রাহুল সিনহা। (১২) সতীদাহ প্রথা নিয়ে তথ্য বিকৃতি মুখ্যমন্ত্রীর, ভুল শোধরাতে বিধানসভার নথি গোপনে পাচার নবান্নে। (১৩) ভাতার কলেজে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের দুই বিবদমান গোষ্ঠীর সংঘর্ষ। (১৪) তৃণমূল দুই গোষ্ঠীর রাতভর বোমাবাজিতে উত্তপ্ত কেতুগ্রাম। (১৫) ফুটবলে ভারতসেরা হওয়াতে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হতে কোনো সম্বর্ধনা জুটল না শতবর্ষ প্রাচীন মোহনবাগান ক্লাবের। (১৬) অভিষেকের নামে থানায় অভিযোগ জানালো, বিজেপি। (১৭) পাণ্ডুয়ায় সিপিএমের প্রধান ও উপপ্রধানকে মারধোর তৃণমূলের। রাজ্যে ধর্ষণ গাণিতিক হারে বেড়েছে। (১৮) জামিন পেলেন অভিযুক্ত সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (২১) তৃণমূল মমতার উত্তরসূরী হিসাবে অভিষেককে তুলে ধরার প্রক্রিয়া তুঙ্গে। (২০) সংখ্যালঘু ভোটের জন্যই যোগদিবসের অনুষ্ঠান এড়ালো রাজ্য। (২১) তোলা না দেওয়ায় সস্ত্রীক ডাক্তারকে মার তৃণমূলের। (২২) দোলার গাড়ি আটকানো সিভিক পুলিশকে ছুটিতে পাঠানো হলো। (২৩) গড়িয়াকাণ্ডে একজন ধৃত তৃণমূল সমর্থক। (২৪) তৃণমূল রাজত্বে কুকুরের ডায়ালেসিসের ব্যবস্থা।

খবর পড়া এখনকার মতো এখানেই শেষ হলো।

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী।

হিন্দুর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ

শ্রীলেখা শ্রীবাস্তব

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১১৫তম জন্মোৎসব আমরা এখন পালন করছি। এই দিনটিকে কিছু বাঙালি একটি পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন বলে মনে করে। কিন্তু কেন পালন করছি তা বহু বাঙালি এবং ভারতবাসী জানে না।

এটা জানতে বা বুঝতে হলে আমাদেরকে অতীতকালের দিকে তাকাতে হবে। ১৯৪৯ সালে ধর্মের ভিত্তি ভারত বিভাজন হলো। নেহরু-কংগ্রেসের নেতৃত্বে, জিন্নার মুসলিম লিগ এবং মাউন্টব্যাটেনের প্রচেষ্টায় ভারতমাতার বিভাজন হলো মহাত্মা গান্ধীকে সামনে রেখেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকাগুলি হলো পাকিস্তান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের এলাকাগুলি ভারত অথবা হিন্দুস্থান। ক্ষমতালোভী কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ নিজ নিজ রাজত্ব নিয়ে মহাসুখে তড়িঘড়ি রাজত্ব করবার লোভে মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ করতেও বিন্দুমাত্র দুঃখ অথবা দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে পাকিস্তানে আরম্ভ হলো পৃথিবীর জঘন্য হিন্দুহত্যা। লক্ষ লক্ষ সর্বহারা বাঙালি হিন্দু নিজেদের জানপ্রাণ রক্ষার্থে রক্তাক্ত কলেবরে ভারতে প্রবেশ করতে লাগল। সমগ্র বিশ্ব সাক্ষী হয়ে রইল লক্ষ লক্ষ হিন্দু হত্যা, পাশবিক অত্যাচার, নারী ধর্ষণ, লুঠতরাজ ও অগ্নিদহনের। হিন্দুরা স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি পাকিস্তানে ফেলে এল হিন্দুস্থানে আশ্রয়ের জন্য। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী চরম বিচলিত হলেন। হিন্দু রক্ষার্থে এক দুর্বার আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন। তিনি জিন্নার অস্ত্র দিয়ে জিন্নাকেই আঘাত হানলেন। অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বললেন, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাতে যদি একটা বৃহৎ অংশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন দেশ পাকিস্তান হতে পারে, তাহলে সেই একই কারণে, একই যুক্তিতে পাকিস্তানে হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং জেলাগুলি কেন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে না? তাঁর এই যুক্তির কাছে ক্ষমতালোভী কংগ্রেসের দল,

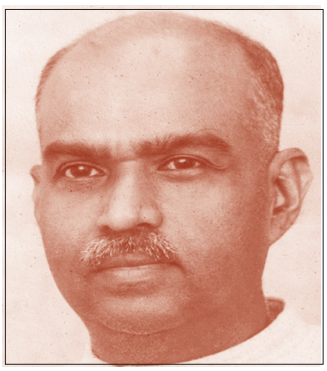

পাকিস্তান-দরদি সিপিএম, এমনকী মাউন্টব্যাটেন পর্যন্ত বোবা হয়ে গেল। জিন্নার মুখে কথা বেরল না। আর এই অকাট্য যুক্তির কাছে পৃথিবীর তৎকালীন তাবৎ শক্তিকে মাথা নোয়াতে হলো। ড. শ্যামাপ্রসাদ পাকিস্তানের কবল থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাব থেকে পাঞ্জাবি- হিন্দুবহুল জেলাগুলি ছিনিয়ে নিয়ে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করলেন।

তারপর থেকে ১৯৫০, ১৯৬৪, ১৯৭১-৭২, ১৯৯২, ২০০১ পর্যন্ত ইসলামি বাংলাদেশ থেকে ক্ষেপে ক্ষেপে অত্যাচারিত হিন্দু বাঙালি জান-প্রাণ ও মান বাঁচাতে পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করেছে। যেমন আমরা সসম্মানে পশ্চিমবাংলার বুকে মাথা উঁচু করে স্বাভিমানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, তেমনি এই সকল শরণার্থীরাও আজ সসম্মানে আমাদেরই মতো মাথা উঁচু করে বসবাস করবার স্থান পেয়েছে। আমরা সবকিছু ভুলে বসে আছি। আমাদের সর্বাধিক দুর্ভাগ্য যে ৭০০ বছরের দাসত্বের পর একদিনের জন্যও দেশপ্রেমী, রাষ্ট্রবাদী এবং সচ্চরিত্রের সরকার পাইনি। ৬৪ বছরের কংগ্রেস এবং ৩৪ বৎসরের ইসলামপন্থী সিপিএম ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টায় ভারতবাসী তথা বাঙালির মস্তিষ্ক ও মানসিকতা, শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, এমনকী বাঙালির চিন্তন, দর্শন ও আধ্যাত্মিক স্তরকে পর্যন্ত ধ্বংস করে ফেলার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ইতিহাসের প্রকৃত অস্তিত্বকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টায় তারা বহু অংশে সফল। তাইতো আজ আমরা এই পশ্চিমবাংলায় দাঁড়িয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদকে ভুলে ভোটব্যাঙ্কের খেলায় মেতে উঠেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলমন্ত্র রাষ্ট্রবাদ ও দেশপ্রেম তা পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতায়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার রাষ্ট্রীয়করণ করে রাজনৈতিক দলগুলি বুক চিতিয়ে তুষ্টিকরণ করছে, মেকি সেক্যুলারিজম-এর বুলি তোতাপাখির মতো আওড়াচ্ছে, আর ভোটব্যাঙ্ক কবজা করবার জন্য দুনিয়ার ছক ও অঙ্ক কষছে এবং দুর্বার কলাকৌশল করে সংখ্যালঘুর প্রিয়ভাজন হবার চেষ্টা করছে। এইরকম চলতে থাকলে পশ্চিমবাংলার ভরাডুবি যে আসন্ন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চিন্তন এবং মননের জন্য বাঙালির হাতের সময় ফুরিয়ে এসেছে। দূরদর্শিতা একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেছে? শিথিল হয়ে গেছে তাদের বাহুবল? হৃদয় আর মস্তিষ্কের সমন্বয় কী এতটাই স্বার্থান্বেষী হয়ে গিয়েছে যে আত্মবিস্মৃতিকে আমরা প্রকৃত জ্ঞান বলে অনুভব করছি। আত্মবঞ্চনায় আমরা তুষ্ট। ঝুঁকিবিহীন নিশ্চিন্ত জীবনে এখন আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু এই নিশ্চিন্তটাই বা আর কদিন? অশনি সংকেত তো দেখতে পাচ্ছি।

সমগ্র পৃথিবীতে জেহাদ চলছে। চলছে অমানবিক পাশবিক হিংসা ও হত্যা শুধুমাত্র ইসলামিকরণের জন্য। জানি আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ইসলামিকরণের জন্য কম রক্তগঙ্গা বহেনি। সোমনাথ, কৃষ্ণজন্মভূমি, কাশীবিশ্বনাথ, অযোধ্যা এবং ভারতের লক্ষ লক্ষ মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে আছে। তবুও ভারতের স্বরূপ, প্রকৃতি এবং চরিত্র বিশ্ব দরবারে তার কোনো পরিবর্তন কেউ ঘটাতে পারেনি। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও সত্য যে কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো বিকৃতি নিশ্চয়ই ঘটেছে তা না হলে অখণ্ড ভারত এইরকম ছোট হতে হতে এত ছোট কী করে হলো? কী করে ভারতীয় জনজীবন, ভারতীয় সংস্কৃতি তার ভাবধারা থেকে ছিটকে পড়ল? কেন আমরা নিজস্ব সত্তাকে হারিয়ে চোখ বুজে এবং দিশাহীনভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগোতে থাকলাম?

তাই নতুনভাবে ভাবনার আবশ্যক। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আত্মা কখনই শান্তি পাবে না যদি পশ্চিমবঙ্গবাসী তাঁর ভাবধারা, উদ্দেশ্য এবং বলিদানকে যোগ্য সম্মান না দিতে পারে।

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা

পরম্পরা

প্রশান্ত চৌধুরী

ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্ম যে চারটি মূল স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো— জন্মান্তরে বিশ্বাস, জীবের কর্মফল ভোগ, আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও গুরুতত্ত্ব। প্রথম তিনটি স্তম্ভ সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত এবং চতুর্থ স্তম্ভ অর্থাৎ গুরুতত্ত্ব এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের পথপ্রদর্শনকারী শক্তি। প্রশ্ন হলো, এই বিষয়গুলির ভিত্তি কি শুধুমাত্র কিছু ধারণা নাকি এর পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আছে?

মূলত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির পটভূমিকায় যে মহাজাগতিক ঘটনার রহস্য শতাব্দীর পর শতাব্দী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সকল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মানসকে সবচেয়ে বেশি আলোকিত করেছে এবং এখনও করে চলেছে— সেটি হলো জড়ের বুকে প্রাণের স্পন্দন যাকে বলা যেতে পারে জড়ের মধ্যে দিয়ে চেতনার আত্মপ্রকাশ, আর তারই উত্তরের সন্ধানে তিনটি প্রশ্ন বারে বারে মানব সমাজের সামনে এসেছে। প্রথম প্রশ্ন হলো, আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাব? এখানে আসার উদ্দেশ্য কী? দ্বিতীয় প্রশ্ন— এই জগৎ কী? কোথা থেকে এসেছে? কোথায় যাবে? কেন এই জগতের অস্তিত্ব? তৃতীয় প্রশ্ন— এই জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? প্রথম প্রশ্নের বিষয়ে পাশ্চাত্যে কোনো আলোকপাত করা হয়নি। দ্বিতীয় প্রশ্নের উপর অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এর সমাধানের জন্য পরিপূর্ণ প্রয়াস চলছে আর যেহেতু পাশ্চাত্য প্রথম প্রশ্নের ভিতরে প্রবেশই করেনি সেহেতু তৃতীয় প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তাদের কাছে পাওয়া যায়নি। মানুষ সম্বন্ধে বিচার করতে গিয়ে তাঁরা শুধু বলেছেন, **Man is a rational being** —মানুষ একটি যুক্তিবাদী প্রাণী, **Man is an economic being** —মানুষ একটি আর্থিক প্রাণী, **Man is a social animal** —মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী। মানুষ সম্পর্কে তাঁদের বিচার এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের মহান দ্রষ্টা ঋষিপুরুষেরা এই তিনটি প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশে দীর্ঘ সাধনার পর অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে যে চরম সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন তা হলো এই জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই নিত্য পরিবর্তনশীল জগতের পিছনে এমন এক অপরিবর্তনীয় আধারভূত পরমতত্ত্ব আছে যার উপরে ঢেউয়ের মতো ভেসে ওঠে এই নামরূপ জগৎ। যেমন সমুদ্রের ঢেউ সমুদ্রেই বিলীন হয়ে যায় সেইরকম এই পরমতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত জগৎ তাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। জলের মধ্যে ভেসে ওঠা বুদবুদ জলেই মিশে যায় তার পৃথক কোনো অস্তিত্ব আর থাকে না। আমরা সবাই সেই ঢেউ বা বুদবুদের মতো। আমাদের কারোরই কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। সেই পরমতত্ত্ব স্বরূপ পরমাত্মা থেকেই আমাদের সৃষ্টি, সেখানেই স্থিতি আবার সেখানেই লয়। এই চরম সত্যের আধারেই মনুষ্য জীবনের সঙ্গে সৃষ্টিচক্রের যে অনন্তকালের সম্পর্ক, তারই অভিব্যক্তি উল্লেখিত চারটি স্তম্ভ। যদিও এই বিষয়গুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী বিচার মেনে নিতে চায় না। কারণ এ হলো অনুভূতজাত সত্য আর যা অনুভূতি নির্ভর তার প্রামাণিকতা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে পাওয়া সম্ভব নয় এবং প্রসঙ্গত বিজ্ঞান স্বয়ং আজ অনুভূতির জগতে প্রবেশ করেছে, তাই সেখানে আজ এসেছে **Uncertainty Principle** (অনিশ্চয়তার তত্ত্ব), এসেছে **Nondetermirism** (যা সঠিক রূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়)। তাই বিজ্ঞানকেও আজ বলতে হচ্ছে যে পরীক্ষাগারে সবকিছুকেই প্রমাণ করে দেখিয়ে দেওয়া যাবে না। বিবেকানন্দ সেই জন্যই বলেছিলেন **A day will come when physics enter into Metaphysics** (এমন একদিন আসবে যেদিন বিজ্ঞানকেও ভাবজগতে প্রবেশ করতে হবে)। একমাত্র অন্তর্জগতেই যে চরম সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব— বিজ্ঞান আজ ক্রমশ সেইদিকেই অগ্রসর হচ্ছে। তাই আমাদের মহান দ্রষ্টা ঋষিপুরুষেরা সনাতন হিন্দুধর্মের যে যাবতীয় সিদ্ধান্তসমূহ দিয়ে গেছেন, কালক্রমে বিজ্ঞানের মাধ্যমে সেগুলিই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। সেজন্য আমাদের জাগতিক সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে গুরুতত্ত্বের স্বরূপকে অনুধাবন করা উচিত।

গুরু কে? যে পথপ্রদর্শনকারীর মাধ্যমে শিষ্যের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হয়— তিনি গুরু। তাই বলা হয়েছে।

গু-কারশ্চান্ধকারো হি রু-কারস্তেজ উচ্চতে।
অজ্ঞানগ্রাসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ।।

'গু' হলো অন্ধকার, 'রু' হলো আলো— অর্থাৎ অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করে পরমতত্ত্বকে জানার জন্য যিনি আলোর পথ দেখান— তিনি গুরু। কারণ এই অজ্ঞানতার জন্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আজ আমাদের কাছে বহুধাখণ্ডিত— আমরা সবাই আলাদা, পৃথক, অপূর্ণ। তাই প্রত্যেকেই আমরা নিজেদের পৃথক সত্তার প্রতিষ্ঠা পেতে চাই, প্রয়োজনে সংঘর্ষ কর, যুদ্ধ কর। কিন্তু আমাদের ঋষিদের গভীর সাধনায় উদঘাটিত হয়েছিল যে চরম সত্য— এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড এবং পূর্ণ তাই অসীম ও অনন্ত। দুটি অপূর্ণ কখনও পূর্ণের সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং এর প্রতিটি সত্তাই পূর্ণ আর এই আপাত অপূর্ণতার মধ্যেই আছে পূর্ণতার স্বরূপ। তাই ঋষিদের ঘোষণা—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং, পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়, পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

অনন্ত কখনও দুটি হয় না। অনন্ত সর্বদা এক। গণিত শাস্ত্র সেই কথাই বলছে ∞ + ∞, ∞ – ∞,

∝ × ∝, ∝ ÷ ∝, উত্তর সবক্ষেত্রেই ∝ (ইনফিনিটি), তাই পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলে, পূর্ণের সঙ্গে পূর্ণের যোগে, পূর্ণই থাকে। পূর্ণ কখনই দুটি হতে পারে না। তাই গুরু হলেন তিনি যিনি সমস্ত অন্ধকারকে দূর করে আমাদেরকে আমাদের স্বরূপ চিনিয়ে দেন— অর্থাৎ আমরা সবাই অখণ্ড ও পূর্ণসত্তা। আর যার জীবনে যেদিন এই পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে সেই দিনটি তার কাছে পূর্ণিমা— যার প্রতীকরূপে চন্দ্রের ষোলকলায় পূর্ণতা প্রাপ্তির ঘটনাকে আমরা পূর্ণিমা তিথি রূপে চিহ্নিত করেছি। গুরুর মাধ্যমে এই পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। সেইজন্য তাকে আমরা গুরুপূর্ণিমা উৎসব হিসাবে আমাদের হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা করেছি, শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছি; শুধুমাত্র একটি উৎসব পালন করার জন্য নয়। এ হলো আমাদের জীবনের নিরন্তর প্রবাহকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করার, যা আমাদের সমস্ত সংকীর্ণতার গণ্ডিকে অতিক্রম করে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটায়। তাই ছন্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে ''যো বৈ ভূমা তৎসুখং; নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি''। অর্থাৎ যাহা ভূমা তাহাই সুখ। ভূমা শব্দের অর্থ বৃহৎ, অসীম, পূর্ণ, ব্রহ্ম। যা ভূমা নয় সেটাই অল্প, সে সসীম, সীমাবদ্ধ। উৎপত্তি থেকে বিনাস পর্যন্ত কালের মধ্যেই তার স্থায়িত্ব। তাই সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রকৃত সুখের অবস্থান নেই, কারণ সে কালেও অল্প— সীমাবদ্ধ। তাই বলা হচ্ছে অল্পে সুখ নাই, ভূমার মধ্যেই পাওয়া যায় প্রকৃত সুখের উপদান— সেখানেই হয় পূর্ণতাপ্রাপ্তি। তাই ভূমাই হলো আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য এবং সেই জিজ্ঞাসার উত্তরদাতা স্বয়ং বেদ।

অগণিত বৈদিক ঋষির সত্যোপলব্ধির আলোয় উদ্ভাসিত সেই বেদকে বিষয় অনুযায়ী ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চতুর্ধারায় বিভাজিত করে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রূপান্তরিত হয়েছিলেন বেদব্যাস রূপে। ব্যাসের অর্থ বিভাজনকারী— বেদের বিভাজনকারী তাই বেদব্যাস আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে নীল যমুনার এক দ্বীপভূমিতে হয়েছিল তাঁর জন্ম আর এই দিনটিকেই আমাদের সমাজ ব্যাস পূর্ণিমা বা গুরুপূর্ণিমা রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু কেন? এমন কোন কীর্তি তিনি স্থাপন করে দিয়ে গিয়েছিলেন যার কারণে সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজ তাঁকে এই মান্যতা দিয়েছে। দেখা যাক— বেদ বিভাজন ছাড়াও তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ব্রহ্মসূত্রের রচনা। যা বেদান্ত দর্শন, বেদান্ত সূত্র, উত্তর মীমাংসা নামেও পরিচিত। তিনি বেদের জ্ঞানকাণ্ড রূপী বিশাল উপনিষদের ক্ষীর সমুদ্রকে মন্থন করে এই দিব্যসুধা সংগ্রহ করেছিলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। যার মধ্যে চার অধ্যায় তিনি সূত্রাকারে নিজ সিদ্ধান্ত প্রোথিত করে গিয়েছিলেন চারটি বিষয়কে ভিত্তি করে— ব্রহ্মের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির অন্তরায় বা বাধা। যার মাধ্যমে তিনি সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্বমীমাংসা-সহ বিভিন্ন দর্শনাদি, বিভিন্ন মতবাদ যেমন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, নিরীশ্বরবাদ এবং শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, পাশুপত, গাণপত্য, অগ্নির উপাসক, নিরাকারবাদী, সাকারবাদী ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়গত ভাবনার কোনোটাকেই অস্বীকার না করে সবাইকে একই বেদীমূলে নিয়ে এসে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনকে সমস্ত বিচারের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গিয়েছিলেন যাকে আধুনিক বিজ্ঞানও আজ উপেক্ষা করতে পারছে না। এইভাবেই ঋষিগণের কল্পান্তব্যাপী চিন্তা ও দার্শনিক বিচারেও যে সত্যের সঠিক প্রকাশ মনুষ্য সমাজের প্রাপ্ত হয়নি, মানব জ্ঞানের পরিসীমাকে উত্তীর্ণ করে সেই ব্রহ্মসূত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ব্যাসদেবের কঠোর সাধনায়। আর কী কীর্তি ছিল তাঁর? তিনিই ছিলেন মহাভারতের রচয়িতা এবং কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্য সমগ্র বেদের ভাষ্যরূপী যে গীতার উদঘোষণা করেছিলেন প্রাকৃত ভাষায়, বেদব্যাস তাকেই সংস্কৃত শ্লোকের আকারে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অষ্টাদশ পুরাণও তাঁরই সৃষ্টি। তাই তিনিই ছিলেন পুরাণ বক্তা। এছাড়াও বৃহৎসংহিতা, দণ্ডকদর্পণ, যোগসূত্রভাষ্য, শিবতত্ত্ববিবেক, তীর্থপরিভাষা, বিশ্বনাথাষ্টক সহ বহু মূল্যবানগ্রন্থ তাঁরই রচনা। গল্প ও উপাখ্যানের মাধ্যমে পরাবিদ্যা (জাগতিক জ্ঞান) ও অপরা বিদ্যার (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) প্রসার, সামবেদের প্রসার এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সৃষ্টি করে মহর্ষি বেদব্যাস মানুষের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে পূর্ণতা প্রাপ্তির বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে এঁকে দিয়ে গেছেন। সেই জন্য কী আধ্যাত্মিক জগতে, কী দর্শন সাম্রাজ্যে, কী সামাজিক জীবনে মহর্ষি বেদব্যাসই হলেন সেই পুরোধা পুরুষ, সেই আচার্য যিনি জগতগুরু, আদিগুরু রূপে আমাদের সমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দী পূজিত হয়ে আসছেন। গুরুপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে ব্যাসপূজার মধ্যে দিয়ে এইভাবেই আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গুরুতত্ত্ব তথা গুরু পরম্পরার মাহাত্ম্য। গুরুপূজার অর্থই গুরুর চরণে নিবেদন, সমর্পণ। কারণ গুরুই হলেন পূর্ণতা প্রাপ্তির মাধ্যম। তাই গুরুর স্থানকে সবার উপরে রেখে আমরা বলেছি ''গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ/গুরু সাক্ষাৎ পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।'' অর্থাৎ গুরুই হলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তাইতো আমরা শ্রীশ্রীগুরুপ্রণাম মন্ত্রে উচ্চারণ করেছি—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় যে এই পূর্ণতা প্রাপ্তির পথের মধ্যে ভিন্নতা আছে। কারণ সবার রুচি ও সামর্থ্য এক নয় আর এই পথকেই আমরা বলেছি যোগ, যেহেতু তা ব্যক্তিকে তাঁর স্বরূপরূপী পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে পরমাত্মাতেই বিলীন করে দেয়। এই পথ কর্মের হতে পারে, জ্ঞান অথবা বিশ্লেষণাত্মক হতে পারে, ভক্তির হতে পারে, শরীর ও মনকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করেও হতে পারে। এই পথের ভিন্নতার কারণে গুরুর ভিন্নতাও স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় আর এখানেই প্রয়োজন গুরুশক্তির। কিন্তু এই গুরুশক্তি কি কোনো ব্যক্তির? মূলত শক্তি সর্বব্যাপী যা পরমাত্মারই প্রকাশ। তাই ঋষিরা বলে গেছেন ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। আর এই শক্তির প্রকাশ ঘটে ভিন্ন রূপে। তাই গুরুশক্তি পরমাত্মারই

একটি বিশেষ শক্তি যা কোনো ব্যক্তি, প্রতীক বা যে কোনো মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করেন যা সময় ও পরিস্থিতির বিচারে ব্যক্তিগত স্তরেও হতে পারে আবার সমষ্টিগত স্তরেও হতে পারে। এই ব্যক্তি জীবন ও সমষ্টি জীবন উভয় ক্ষেত্রেই গুরুসম্বন্ধীয় অসংখ্য উদাহরণে পূর্ণ আমাদের ভারতীয় তথা হিন্দুসমাজ। এইখানেই এসেছিল সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক কাকে গুরু হিসাবে মেনে নেবে, কে হবেন সঙ্ঘের পথপ্রদর্শনকারী?

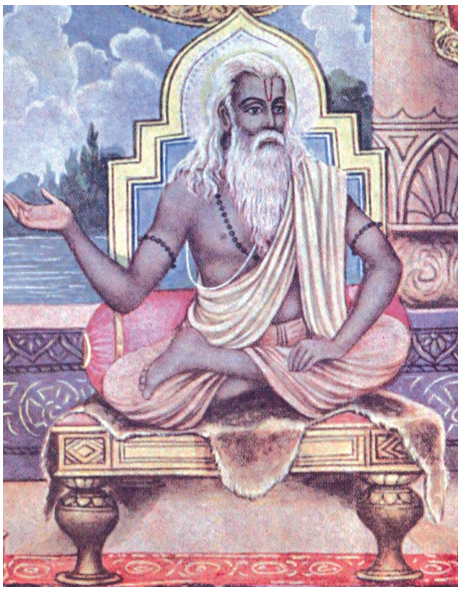

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো তা সমাজের ভিতরের কোনো পৃথক সংগঠন নয়, সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের সংগঠন অর্থাৎ সমাজ ও সঙ্ঘ এক। তাই হিন্দু সংস্কৃতি ও পরম্পরা অনুসারেই সঙ্ঘের গুরুকরণ করা হয়েছে যেখানে কোনো ব্যক্তিকে রাখা হয়নি, রাখা হয়েছে পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজকে গুরুশক্তির আধার রূপে। কারণ এই ধ্বজের পরম্পরা ও ইতিহাসের প্রারম্ভ হয়েছে ভারত আত্মার মূর্তরূপ বেদ থেকে। যেখানে তাঁর বর্ণনা করা হয়েছে 'অরুণ সস্তু কেতবঃ' বলে। অর্থাৎ উষা লগ্নে সকল অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আলোর বার্তাবহনকারী সূর্যদেবের দিগন্তব্যাপী গৈরিক ছটার পূর্ণ অভিব্যক্তি এই ধ্বজ। যাঁকে সামনে রেখে শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ করেছিলেন, যে ধ্বজকে শোভিত হতে দেখেছি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের রথে, এই ধ্বজের প্রেরণাতেই ছত্রপতি শিবাজী হিন্দুসাম্রাজ্যকে ধর্মরাজ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই গৈরিক বর্ণের মাহাত্ম্যকে ভারতবর্ষের সমাজ যুগ যুগ ধরে সম্মান দিয়ে এসেছে। সেই জন্যই সন্ন্যাসীগণ গৈরিক বসন পরেন তাঁদের ত্যাগময় জীবনকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করার জন্য। তাই আমরা দেখেছি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গকারী— মহান আচার্য দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ স্বয়ং গৈরিক বেশ ধারণ করেছিলেন আর সমাজের রক্ষক হিসাবে যে খালসা পন্থ সৃষ্টি করেছিলেন তারও সামনে রেখেছিলেন এই ধ্বজকে। এই ধ্বজের প্রেরণা নিয়েই কত অসংখ্য রাজপুত যোদ্ধা দেশমাতৃকার জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়ে গেছেন। মাতৃভূমিকে রক্ষা করার মহান কর্মযজ্ঞে এইভাবেই কত ভারত-সন্তান তাঁদের জীবন আহুতি দিয়ে গেছেন। তাই এই গৈরিক বর্ণ সেই যজ্ঞাগ্নির পবিত্র প্রতীক যার মধ্যে তেজ, ত্যাগ, তিতিক্ষা, পবিত্রতা ও সর্বস্ব সমর্পণের ভাবনার সমন্বয় হয়েছে যা কোনো এক ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ দোষত্রুটি মুক্ত, সর্বগুণান্বিত, সর্বমান্য ব্যক্তি দুর্লভ। এছাড়াও ব্যক্তি নশ্বর। সমালোচনার ঊর্ধ্বে সে যেতে পারে না। তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম কোনো সমাজ কোনো একজন ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করে নেবে এটাও ভেবে নেওয়া সমীচীন নয়। সর্বোপরি বিভিন্ন গুরুপরম্পরায় আস্থাশীল আপামর হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে একক ব্যক্তি-গুরুতে শ্রদ্ধাবনত হওয়াও সম্ভব নয় এবং চিরন্তন রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তি হলো এক অপসৃয়মান অস্তিত্ব। তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যুগযাগান্তর ব্যাপী কালপ্রবাহে সমাজ দ্বারা স্বীকৃত শাশ্বত ও সনাতন হিন্দুত্বের সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতীকরূপী পরম পবিত্র গৈরিক পতাকাকে গুরুর স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু আধুনিক ভারত তাঁকে মেনে নেয়নি কেন? কোথায় এর উত্তর পাওয়া যাবে?

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সম্পূর্ণ সমাজের সংগঠন হওয়ার কারণেই সমাজের সামনে আজ তার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন গৈরিক ধ্বজ জাতীয় পতাকা হলো না কেন, যখন ফ্ল্যাগ কমিটির সর্বসম্মত সুপারিশ ছিল গৈরিক পতাকাকেই জাতীয় পতাকা করার? **Report of the National Flag Committee, 1931** সালে লিখেছিল— ''ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পতাকা একটিমাত্র রঙের হবে এবং তা হবে গৈরিক রঙের; তাতে ধ্বজদণ্ডের পাশে থাকবে চক্রের ছবি। কমিটি স্পষ্টরূপে লিখেছিল গৈরিক রঙ ভারতীয় পতাকার নির্দেশক। কেবলমাত্র গৈরিক রং-ই ভারতীয় জনজীবনের ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এর একটি নিজস্ব আবেদন রয়েছে এবং তা ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অনুকূল। কিন্তু আমাদের এই প্রাচীন সমাজ কালের অমোঘ নিয়মে বহু ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে আজ রাজনীতির শিকারে পরিণত হয়েছে, গৈরিক ধ্বজও তার থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। তারই পরিণাম স্বরূপ ফ্ল্যাগ কমিটি-র প্রতিবেদনকে নস্যাৎ করে দিয়ে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থেই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে জাতীয় পতাকা রূপে ঘোষণা করে দেওয়া হলো, যেন গৈরিক পতাকা চরম অপরাধী। রাজনীতি সর্বস্ব সমাজের কাছে এটাই আমাদের প্রাপ্য। তবে ধর্মচক্র যুক্ত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা আধুনিক রাজনৈতিক সংবিধান স্বীকৃত ভারতের জাতীয় পাতাকা; তাই অবশ্যই তাঁকে আমরা যথোচিত সম্মান এবং মর্যাদা দিয়ে থাকি। তবে গুরুর প্রাপ্য মর্যাদা গৈরিক হিন্দু সমাজ দিয়ে থাকে। কারণ শাশ্বত ভারতবর্ষের এটিই পরম্পরা যা বেদ নির্দেশিত। সেইজন্যই আবহমানকাল থেকে গুরু ও শিষ্যের মধুর সম্পর্কের ধারাই ভারতবর্ষ তথা হিন্দুসমাজকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। একজনের আশ্রয় দান, অপরের সমর্পণ; একজনের পথপ্রদর্শন, অন্যজনের আজ্ঞাবহতা— এর মধ্য দিয়েই অধ্যাত্মজ্ঞান ও রাষ্ট্রভক্তির সমন্বয় সাধন হয়েছে ভারতবর্ষে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর বৌদ্ধিক প্রমুখ)

গুরু-শিষ্য

কবিগুরু ও মানিক

মায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এসেছে মানিক। পৌষমেলা দেখতে। তখন তার বয়স মাত্র সাত বছর। এই মানিক হলো সত্যজিৎ রায়ের ডাক নাম।

শান্তিনিকেতনে কবিগুরুকে খুব দেখার ইচ্ছে মানিকের। রায় পরিবারের সঙ্গে রবিঠাকুরের খুব ভাল সম্পর্ক। মানিকের বাবা সুকুমার রায়কে তিনি খুব স্নেহ করতেন। মৃত্যুশয্যাতে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন তিনি। মানিকের জন্মের পর রবিঠাকুর তার একটি নাম রেখেছিলেন। মানিকের জন্য একটি সহজ নাম চাইছিলেন সুকুমার রায়। রবীন্দ্রনাথ ভেবেচিন্তে তার নাম দিয়েছিলেন সরিৎ। কিন্তু বালক মানিক গুরুদেবকে কাছে থেকে তেমন দেখেনি। তাই তার ইচ্ছে মেলা দেখার পর গুরুদেবকে প্রণাম করতে যাবে সে। শান্তিনিকেতনে কবিগুরুকে সবাই গুরুদেব বলে।

মা সুপ্রভাদেবী মানিককে নিয়ে উত্তরায়নে গেলেন গুরুদেবের কাছে। মানিকের হাতে সদ্য কেনা নতুন একটা অটোগ্রাফের খাতা। মনে মনে ঠিক করেছে খাতাটি রবীন্দ্রনাথের সই দিয়ে শুরু করবে। অনেকের কাছে সে শুনেছে গুরুদেব নাকি সইয়ের সঙ্গে অনেক সময় কবিতাও লিখে দেন। মানিকের মনে খুব উত্তেজনা হচ্ছিল, গুরুদেব যদি তাকেও একটা কবিতা লিখে দেন।

মায়ের হাত ধরে মানিক উত্তরায়নে প্রবেশ করল। তারপর গুরুদেবকে প্রণাম করে এগিয়ে দিল তার নতুন খাতাখানি। সুপ্রভাদেবী অনুরোধ করলেন তাতে কিছু লিখে দেওয়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথ খাতাখানি নিয়ে বললেন— খাতাটি রেখে যাও কাল সকালে এসে নিয়ে যাবে। মানিকের মন আনন্দে নেচে উঠল। প্রথমবার সে কবিগুরুকে এত কাছে থেকে দেখছে, তার উপর তিনি তার খাতাতে কিছু লিখে দেবেন এই শুনে সে মহা আনন্দে উত্তারয়ন থেকে ফিরে এলো।

পরের দিন সকাল হতেই মানিক উত্তরায়নে এসে হাজির। গুরুদেব খাতাটি মানিকের হাতে তুলে দিলেন। মানিক দেখল— খাতাতে কবির স্বাক্ষর এবং পাতা জুড়ে তার স্বহস্তে লেখা আট চরণের একটি কবিতা। কবিকে প্রণাম করে মানিক ফেরার পথ ধরল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে রাস্তাতেই খুলে পড়তে লাগলো সেই কবিতা :

বহুদিন ধরে, বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।।

বালক মানিক সেদিন এই ছোট্ট কবিতার অর্থ বুঝতে পারেনি। মনে কেবল আনন্দের একটা ঝলক খেলেছিল। কিন্তু বড়ো হয়ে সত্যজিৎ রায় যখন এর অর্থ বুঝতে পারলেন তখন তার সামনে ভাবনার এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল।

এই কবিতাই কবিগুরুর কাছে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম শিক্ষা। দেশের যেখানেই তিনি সুন্দর কিছু দেখেছেন সেখানেই মনে পড়েছে কবিগুরুর এই কবিতা। অর বিস্মিত হয়েছেন এই ভেবে যে, সত্যই ঘর থেকে দু'পা বেরোলেই আমাদের চারিদিকে কত সৌন্দর্য, কত সম্পদ। অথচ আমরা তা চোখ মেলে দেখি না। রবীন্দ্রনাথের কাছেই সত্যজিৎ রায় আমাদের দেশের অপার সৌন্দর্যকে দেখতে শিখেছেন। মানিক বড়ো হয়ে অল্প দিনের জন্য কবিগুরুকে পেয়েছিলেন। কিন্তু রবিঠাকুরের দেওয়া প্রথম শিক্ষা তিনি সারাজীবন মনে রেখেছেন।

বিরাজ নারায়ণ রায়

মনীষী কথা

শঙ্করাচার্য

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হয় ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে। কেরলের কালাডি নামে একটি ছোট্ট গ্রামে। মাত্র তিন বছর বয়সেই তাঁর বাবা শিবগুরুর মৃত্যু হয়। তারপর পাঁচ বছর বয়সে মা বিশিষ্টাদেবী তাঁকে গুরুগৃহে পাঠিয়ে দেন। সেখানে দু'বছর অধ্যয়ন করেই তিনি সমস্ত দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-সহ রচনা করেন বহু গ্রন্থ। গুরুগৃহ থেকে ফিরে এসে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সারা দেশে প্রচার করতে থাকেন বেদ বেদান্তের শিক্ষাকে। শঙ্করাচার্য ছিলেন সে যুগের একজন প্রজ্ঞাবান সন্ন্যাসী। বেদান্তকে সবার কাছে পৌঁছে দিতে তিনি ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহাজ্ঞানী, মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রশ্নবাণ

১. দেবগুরু কে?

২. কে জগদ্‌গুরু নামে পরিচিত?

৩. পাণ্ডবরা কার কাছে অস্ত্রশিক্ষা নিয়েছিলেন?

৪. চৈতন্যদেবের গুরু কে ছিলেন?

৫. শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গুরুভাইয়ের নাম কি?

উত্তর : ১. বৃহস্পতি। ২. শঙ্করাচার্য। ৩. দ্রোণাচার্য। ৪. ঈশ্বর পুরী। ৫. সুদাম।

ছবিতে অমিল খোঁজ

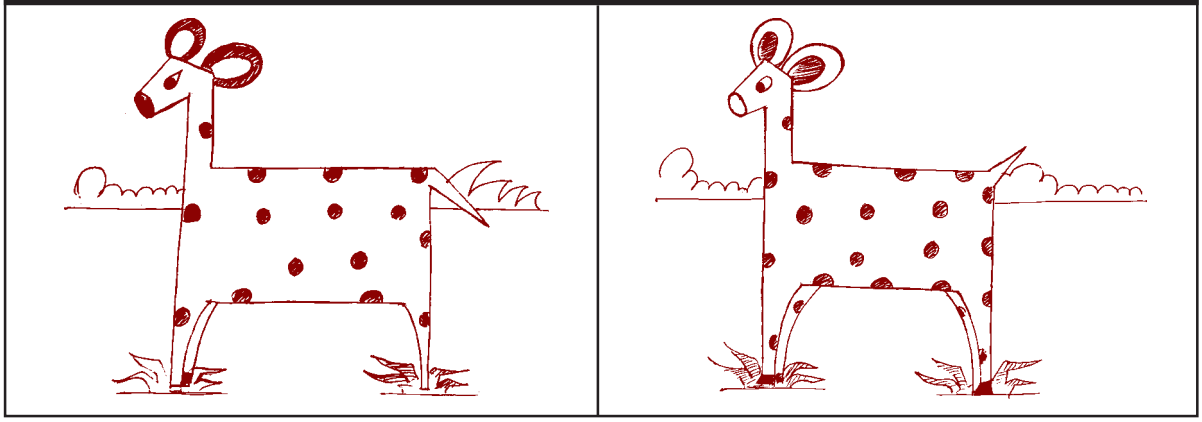

ছোটদের কলমে

দেবীর রূপ

ঈপ্সিতা সাহা নবম শ্রেণী

মা দুগ্গার কত ভিন্ন রূপ
আমরা কেউ জানি না,
ভক্ত শুধু জানে সেরূপ
আমরা তা মানি না।

কত লীলা করে তুমি
মেরেছ মহিষাসুরকে,
কখনও আবার চামুণ্ডারূপে
নেচেছ সারা পৃথিবীতে।

কখনও আবার ছিন্নমস্তায়
পান করেছ নিজের রক্ত,
মা তোমার কী অসীম লীলা
জানে শুধু তোমার ভক্ত।

আমি শুধু জানি এটুকু
তুমিই লক্ষ্মী সরস্বতী
তোমার পদে আমার যেন
চিরদিন থাকে মতি।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

ভারতীয় মেয়েরা কী পাশ্চাত্যমুখী হচ্ছে?

চম্পা মণ্ডল

ভারতীয় সংস্কৃতি শুধু ভারতীয়দের কাছেই নয় সারা বিশ্বে এর সুখ্যাতি রয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী মেয়েরা মায়ের আদর্শ গ্রহণ করে। তা অনুসরণ করতে করতে সবকিছু শিখে যায়। আমরা মেয়েরা বাড়িতে নৈতিকতা শিখে থাকি, আবার কখনও বাড়ির বড়োদের অনুসরণ করতে করতে আচার-ব্যবহার, ভালো-মন্দ বোধ আমাদের মধ্যে নিজে থেকেই চলে আসে।

বর্তমানে ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব পড়েছে— যা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিঘ্নিত করছে। পাশ্চাত্যের ধাঁচে চলতে শুরু করছে ভারতীয় মেয়েরা। ভারতীয় পোশাকে একটি মেয়েকে যথেষ্ট ভালো লাগে এবং রুচিকর মনে হয়। কিন্তু অনেকে এখন নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছেড়ে পাশ্চাত্য পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

শুধু পোশাকেই নয়, আচার-ব্যবহারেও পাশ্চাত্যকরণ চলে এসেছে। নমস্কারের বদলে হাই বা হ্যালো বলে অভিবাদন করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আমাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী জন্মদিনে সন্তানের পরমায়ু বৃদ্ধির কামনায় পরমান্ন (পায়েস) খাওয়ানো হয়। কিন্তু বর্তমানে এই পায়েসের জায়গায় বেশিরভাগ বাড়িতে দখল নিয়েছে রংবেরং-র কেক। আবার আমরা যে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রদীপ জ্বালিয়ে শুরু করি। তেমনি চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী জন্মদিনেও প্রদীপ জ্বালানো হয়। সেখানে বেশিরভাগ মা প্রদীপের জ্বালানোর বদলে মোমবাতি নিভিয়ে ফেলছেন।

অনেক মেয়ে আবার আজকাল মাদকদ্রব্য সেবন করাকে ফ্যাশান বলে মনে করছে। বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে থাকতে কেউ সিগারেটের নেশায় জড়িয়ে পড়ছে, কেউবা মদের নেশায়। শুধু কলেজ বা ইউনিভার্সিটির মেয়েরা নয় শিক্ষিত ধনী

পরিবারের অনুষ্ঠানে এসব সেবন না করলে তাদের 'স্টেটাস মেন্টেন' হবে না, তাই তারা কেউ নিজের কেউবা অন্যের ইচ্ছায় জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন নেশায়।

একজন ভারতীয় নারীকে সকলে মমতাময়ী রূপে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণ ধীরে ধীরে তার আচার-ব্যবহার ভুলিয়ে তাকে শৃঙ্খলাহীন করে তুলছে। আবার কখনও পাশ্চাত্য আদবকায়দায় নিজেকে গড়ার কাজে ব্যস্ত রেখে মাতৃত্বকে বিসর্জন দিচ্ছে। কিন্তু একজন আদর্শ ভারতীয় নারীর তার মাতৃত্ব। সে কখনই তার মাতৃত্ব বিসর্জন দিতে পারে না।

ভারতীয় নারী সব সময় সব জায়গায় উপযুক্ত সম্মানের যোগ্য। আমরা অন্যের আদব-কায়দা গ্রহণ করে নিজের সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত করছি। ভুলতে চলেছি যে আমাদের দেশে সীতা, মা-সারদার মতো নারীরা ছিলেন। রামচন্দ্রের মতো রাজা, বিবেকানন্দের মতো আদর্শবান এবং সুভাষচন্দ্রের মতো দেশপ্রেমিকদের মায়েরা ভারতীয় সংস্কৃতিতেই বড়ো হয়েছেন।

আদিম জীবন থেকে আমরা অনেক উন্নত হয়েছি। কিন্তু সমাজে বর্তমান মেয়েদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আমরা যেন ঠিক তার উল্টো পথেই হাঁটছি। ■

ত্র্যম্বকেশ্বর মহাকুম্ভ মেলা (নাসিক)-২০১৫

শিবশক্তি সেবাধামের উদ্যোগে নাসিকে ত্র্যম্বকেশ্বর মহাকুম্ভ মেলায় শিবির। ভক্তজনের ভোজন, চিকিৎসা ও থাকার সুব্যবস্থা আছে।

(১) প্রথম শাহী স্নান—২৫ আগস্ট (অনুদান— ৩০০০/- টাকা মাত্র)
(২) দ্বিতীয় মুখ্য শাহী স্নান— ১৩ সেপ্টেম্বর (অনুদান— ৩৫০০/- টাকা মাত্র)
(৩) তৃতীয় মুখ্য শাহী স্নান— ১৮ সেপ্টেম্বর (অনুদান— ৩০০০/- টাকা মাত্র)
(৪) অন্তিম শাহী স্নান— ২৫ সেপ্টেম্বর (অনুদান— ৩০০০/- টাকা মাত্র)

বিশেষ সুযোগ :

(১) ১৩ সেপ্টেম্বর ও ১৮ সেপ্টেম্বর এই দুই স্নানের জন্য অনুদান— ৪৫০০/- টাকা মাত্র।

(২) এক মাসের জন্য অনুদান ১৭,০০০ টাকা মাত্র।

অগ্রিম বুকিং করুন।

শুভমঙ্গলম্
হৃষীকেশ ব্রহ্মচারী
শিবশক্তি সেবাধাম, কাশী
ফোন নং-09451268600

দলাই লামা-র জন্য এখনও নীরবে প্রার্থনা করে তিব্বত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০০৮-এর মার্চে তিব্বতীরা যে বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়েছিল, তার সামনে গাজর ঝুলিয়ে চীন যতই তাতে প্রলেপ লেপন করুক না কেন, তিব্বত আছে সেই তিব্বতেই। আগ্রাসনের পর তিব্বতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত নিজস্ব চরিত্রকে ধীরে ধীরে স্থায়ী পরিবর্তনের অভিমুখে চালিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে চীন। একদিকে তিব্বতীদের জন্য কড়া প্রশাসনিক নিয়ম, অন্যদিকে তিব্বতের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করে পরিকাঠামোগত পরিবর্তন--- এর কোনোটাকেই এই আপাত শান্ত তিব্বতীরা মেনে নিতে পারছে না। যেমন মেনে নিতে পারছে না নির্বাসনের এতগুলো বছর পরেও তাদের আধ্যাত্মিক গুরু, একান্তপ্রিয় দলাই লামার অনুপস্থিতি। তাই দলাই লামার ভাবমূর্তিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে প্রচার করে জনসমর্থনের ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও চীনের সকল বাধাকে অগ্রাহ্য করে, জেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুমকিকে তুচ্ছ করে তিব্বত ও তার নিকটবর্তী গানসু এবং সিচুয়ানে ৬ জুলাই (অথবা তিব্বতীয় ক্যালেন্ডার হিসাবে ২১ জুন) দলাই লামার আশিতম জন্মদিবস পালনের উদ্যোগ নিয়েছিল স্থানীয় মানুষ। তিব্বতের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক প্রথার প্রতিনিধিরূপে চীন ১৪তম দলাই লামাকে চিহ্নিত করতে চাইলেও তিব্বতীয় জনসাধারণের কাছে দলাই লামা এখনও 'most important'। এমনকী তিব্বতের আধুনিক প্রজন্মও গোপনে তাঁর জন্মদিনের প্রস্তুতি নিয়েছিল। যদিও তিন শতাধিক বছর পুরনো পঞ্চম থেকে চোদ্দতম দলাই লামার আবাসস্থল লাসার পোটালা প্রাসাদে এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই এই উপলক্ষে ছিল না জন্মদিন পালনের ছিটেফোঁটা চিহ্নও। বরং বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের একদা আবাসস্থল দেয়াং শার আজ পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটকরা আজ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্বেত প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে

দলাই লামার প্রত্যাবর্তনের দাবিতে তিব্বতী যুবকের আত্মাহুতি।

তিব্বত ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ছবি তুলতে ব্যস্ত। অপরদিকে সমগ্র চত্বর জুড়ে রয়েছে উজ্জ্বল কমলাবর্ণের পোশাক পরা যোদ্ধার উপস্থিতি। প্রতিটি কোণায় রয়েছে ইউনির্ফম পরিহিত পিপলস আর্মড পুলিশের অতন্দ্র প্রহরা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত স্নাইপার উপস্থিত থাকলেও এখন তা নেই। পবিত্র ধর্মস্থান আজ সামরিক নজরদারির ঘেরাটোপে বন্দী। দলাই লামার প্রত্যক্ষ উপস্থিতির ওপর এত প্রতিবন্ধকতা চাপানো সত্ত্বেও চৈনিক প্রশাসন তিব্বতীয় জনমানস থেকে ১৪তম দলাই লামার মানসিক উপস্থিতিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি।

২০০৮-এর মার্চে তীব্র বিক্ষোভের পর থেকেই তিব্বতের প্রতি carrot and stick নীতি নিয়েছে চীন। সাত বছর আগের বিক্ষোভের যে আগুন লাসাকে পুড়িয়েছিল, ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারি থেকে যে ১৪১ জন তিব্বতী (যাঁদের মধ্যে রয়েছে সন্ন্যাসী থেকে ছাত্র) নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করার পণ করে গায়ে আগুন দিয়েছে শুধুমাত্র দলাই লামাকে ফিরিয়ে আনার জন্য--- সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তা শক্ত হাতে দমন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে চীন। তাই শহরের প্রধান চত্বর, বলা ভালো প্রতিবাদ চত্বর ঝোখাং-এ ২৪ ঘণ্টা মোতায়েন রয়েছে দুটি বড় কালো বাসভর্তি নিরাপত্তাকর্মী। তবে তিব্বতীয় জনসাধারণের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে চীন বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ। তাদের মতে নির্বাসিত তিব্বতীদের ষড়যন্ত্র এই সকল বিক্ষোভ।

১৯৫৯ সালে বিদ্রোহের সূত্রপাত ও দলাই লামার নির্বাসনের মধ্য দিয়ে চীনের তিব্বত অধিগ্রহণপূর্বক এর সংস্কৃতিকে ধীর গতিতে হলেও স্থায়ীভাবে রূপান্তর ঘটানোর লক্ষ্যে ও দলাই লামার নির্বাসন ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে চীন কিছু উন্নয়মূলক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যদিও তার মধ্যে রয়েছে চৈনিক আধিপত্যের এবং ঔদ্ধত্যের প্রভাব। পুরাতন রাজধানী শহর লাসাকে ঘিরে থাকা রাজপথে আজ চৈনিক মান্দারিন ভাষার বড় বড় হরফে অঙ্কিত পথচিহ্ন তাই ঔদ্ধত্যের জানান দেয়। আর তার ঠিক নীচেই ছোটো হরফে রয়েছে তিব্বতীয় লিপিতে তার পরিভাষা। সাবেক বিংশ শতাব্দীতে এসে লাসা হারিয়েছে তার সাবেকিয়ানা। এই পার্বত্য উপত্যকায় কান পাতলে এখন শুধুই শুনতে পাওয়া যায় হাতুড়ির ঠুক ঠুক আর ড্রিলিং-এর শোঁ শব্দ। অর্থাৎ লাসার পুনর্গঠন ও প্রসারণ পুরোদমে চলছে। শহরতলিতে গড়ে উঠেছে 'new development zone'। চীনা তথ্যানুসারে পিপলস্ লিবারেশন আর্মির

ফঃ ৪

তিব্বত দখলের পর ১৯৫২ সাল থেকে শিল্পক্ষেত্র ৫৪৪ বিলিয়ন য়ুনান (প্রায় নব্বই বিলিয়ন ডলার) বিনিয়োগ হয়েছে। অন্যদিকে লাসার এই পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সংকুচিত হয়ে আসছে লাসার তিব্বতীয়দের প্রাণকেন্দ্র বারখর যার সন্নিহিত পুরাতন রাস্তাগুলো বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত ঝোখাং মঠের অভিমুখে। প্রাচীন এই মঠের কাছেই ১৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তৈরি হতে চলেছে শপিং প্লাজা। আর এর সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বের ধর্মীয়স্থল ব্যবসায়িক স্বার্থের খাতিরে পরিণত হতে চলেছে কর্মব্যস্ত শব্দমুখর রাস্তায়।

চীনের এই তথাকথিত উন্নয়ন যজ্ঞে লাসার 'new develoment zone'-এর ডেভেলপমেন্ট মডেলের অংশহিসাবে ভাটিখানা তৈরিতেও বেজিং তিব্বতীয়দের মদত দিচ্ছে। লু বু সি রেন একজন ভাটিখানার মালিক, যার বিয়ার তৈরির কারখানায় ১৩৫ জন স্থানীয় তিব্বতীরা কাজ করছে। লু-এর কথায় ভাটিখানা তৈরির জন্য প্রাথমিক বিলগ্নি (প্রায় ৩৫ শতাংশ) স্থানীয় উন্নয়নশীল অঞ্চল থেকেই আসে। এখানে বর্তমানে প্রতি বছর ২,৫০,০০০ টন বিয়ার উৎপাতি হয়। একে যদিও চীন 'a symbol of new Lhasa' নামে অভিহিত করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি জাতির স্বাভাবিক বিকাশকে, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকা ধর্মীয় সংস্কারকে নেশায় আচ্ছন্ন করে তাকে দুর্বল করে দেওয়ার এ এক ঘৃণ্য কৌশল ছাড়া কিছু নয়। সত্যই লাসার এ এক নতুন 'symbol'!

গত এপ্রিলে চীন সরকার প্রকাশিত শ্বেতপত্রে তিব্বতের উন্নয়নের এক লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে : দুই সংখ্যার জিডিপি বৃদ্ধি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৯.৫৯ শতাংশের নাম নথিভুক্তকরণ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ৬৪.২ বছর পর্যন্ত, নিরক্ষরতার বিলোপসাধন, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা।

তিব্বতের পরিবহন খাতেও চীন বিনিয়োগ করেছে লক্ষ-কোটি ডলার। বহু অর্থ ব্যয়ে লাসা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংযোগ রক্ষার জন্য বানানো হয়েছে বড় ও চওড়া এক্সপ্রেসওয়ে। এমনকী সিকিমে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত চীন নির্মাণ করে নিয়েছে এই দীর্ঘ সড়কপথ। যা ভারতের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। পৃথিবীর ছাদ অর্থাৎ পামির মালভূমির বুক চিরে সম্প্রসারিত হয়েছে 'মাল্টি বিলিয়ন ডলার' রেলপথ। যদিও এই পরিকাঠামোগত উন্নয়ন চীন আন্তরিকতার সঙ্গে নয়, নিজের কূটনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে করছে।

চীনের এত উন্নয়নমূলক কাজ, চোখ ধাঁধানো উন্নয়নের ফিরিস্তি সত্ত্বেও কেবলমাত্র দলাই লামার নির্বাসনের কারণে বেজিং প্রশাসন তিব্বতীয় জনগণের প্রত্যয় উৎপাদনে ব্যর্থ হয়েছে। লাসার তিব্বতীয় অধিবাসীদের অধিকাংশের মতে, লাসার এই আপাত শান্ত পরিবেশের আড়ালে অবিরাম বয়ে চলেছে অবিশ্বাস্যের এক চোরাস্রোত। চীন যতই দাবি করুক না কেন ২০০৮-এর পর উন্নয়নের চুক্তি হয়েছে তিব্বতের সঙ্গে কিন্তু চীনের এই উন্নয়নের চরিত্র নিয়ে তিব্বতীয়রা যথেষ্ট সন্দিহান ও উদ্বিগ্ন। কারণ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের নামে অস্থায়ী শ্রমিক ও পর্যটন উপলক্ষে যে বিপুল পরিমাণ হান চৈনিক জনগণের আগমন ঘটেছে তাতে বর্তমানে তিব্বত ভূখণ্ডে খোদ তিব্বতীয়রাই সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে চলেছে।

বেজিং সরকারের 'help development' প্রকল্পে উৎসাহিত হয়ে চীনের বহু অধিবাসী তিব্বতে চলে আসছে। চৈনিক সেন্সাসের তথ্যানুসারে তিব্বতের ৩ মিলিয়ান জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ স্থায়ী তিব্বতীয়। যদিও এই সেন্সাসে স্পষ্ট নয় লাসা-সহ তিব্বতের অন্যান্য শহরে স্থানান্তরিত পরিবর্তমান (floating population) চৈনিক জনসংখ্যার সঠিক অঙ্ক। অপরদিকে তিব্বতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী হান চৈনিক সম্প্রদায়ও সংখ্যায় একক দশকের ঘর অতিক্রম করে লক্ষ কোটি ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। স্থায়ী হান জনসংখ্যা ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালে মধ্যে যথেষ্ট বেড়েছে যার ফলে শতাংশের হিসাবে তিব্বতীয়দের সংখ্যা নিম্নাভিমুখী। বর্তমানে বর্ধিত হান জনসংখ্যা ৮ শতাংশ। ২০০০ থেকে ২০১০ এর মধ্যে পরিবর্তমান জনসংখ্যা (floating population) ১,৫১,০০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ২,৬২,০০০ জন (চাইনিজ্ সেন্সাস অনুসারে)। চীনা প্রশাসনের ভয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির বক্তব্য "There are more Han people than Tibetans in Lhasa now."

তিব্বতের ভূমি দখল করেও চীন সন্তুষ্ট নয়। তথাকথিত উন্নয়নের নামে তিব্বতের ভাষা ও সংস্কৃতির উপরেও চুপিসাড়ে আঘাত হানছে চীন। চীনে সরকারি বা কোনো চৈনিক সংস্থায় চৈনিক ভাষা জানে এমন তিব্বতী কর্মীর কদর বেশি। অথচ বেজিং থেকে তিব্বতে আগত কর্মীদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজনই তিব্বতীয় ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন। তবে চাকরিক্ষেত্রে তিব্বতীয়দের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণকে চীন ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। চীনের কোনো প্রকল্প বা খনি সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে তিব্বতীদের প্রতিবাদকে দলাই লামা গোষ্ঠীর মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্যকলাপ বলে প্রচার করা হয়। তবে এত কিছু সত্ত্বেও দলাই লামা প্রসঙ্গ চীনকে কিছুতেই স্বস্তি দিচ্ছে না। বেজিং-এর টিবেটোলজি রিসার্চ সেন্টারের একজন আধিকারিক লিয়াং জিয়াংমিনের কথায়, তিব্বত নিয়ে বেজিং-এর সমস্যাটা দ্বিস্তরীয়। লিয়ান জিয়াংমিনের বক্তব্যানুসারে প্রথমত, দলাই লামা এই তিব্বত ইস্যুটিকে আন্তর্জাতিক স্তরে উত্থাপন করে অযথা জটিলতা বাড়িয়েছেন। দ্বিতীয়ত, চীন অধিকৃত তিব্বত সন্নিহিত সিচুয়ান, গানসু, কুইনখাই এবং য়ুনান প্রদেশ-সহ তিন মিলিয়ন নাগরিকে সমৃদ্ধ তিব্বতের মানচিত্র পুনরায় তৈরি করা সহ ভাষা ও ধর্ম ক্ষেত্রে স্বশাসনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন দলাই লামা। বলাই বাহুল্য, এই দুই প্রস্তাবের কোনোটাই চীনের স্বার্থের স্বপক্ষে নয়।

দলাই লামার শারীরিক উপস্থিতির উপর চীন যতই প্রতিবন্ধকতা চাপানোর চেষ্টা করুক না কেন, তিব্বতীয় জনমানসে তাঁর প্রভাবকে কখনই অস্বীকার করতে পারবে না চীন। তাই যতদিন কূটনীতিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ দলাই লামা তাঁর বরাভয় তিব্বতের উপর রাখছেন, ততদিন পর্যন্ত তিব্বতের সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিকরণ চীনের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। ■

যোগের নেপথ্যে যাঁরা...

রিনি রায়॥ দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর যোগপ্রচারে উদ্যোগী হলো রাষ্ট্রযন্ত্র। চল্লিশ বছর পূর্বে রাষ্ট্রীয় চ্যানেল দূরদর্শনের পর্দায় যোগ সম্প্রচারের পিছনে ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তখন যোগাচার্য ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সখ্য। যদিও সেই সম্প্রচার সার্বজনিক রূপ ধারণ করেনি বা জনমানসে সেরকম প্রভাব ফেলেনি। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসি সরকার ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যকে কখনই আন্তরিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেনি। অপর দিকে ২০১৫-তে ভারতীয় যোগকে বিশ্বের দরবারে এক অনন্য সাধারণ উচ্চতায় তুলে ধরলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। গত ২১ জুন বিশ্ববাসীকে উপহার দিলেন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের এক অমূল্য উপহার। সেদিন পৃথিবীর ১৭৭টি দেশ ও জল-স্থল-অন্তরীক্ষ মেতে উঠেছিল যোগ অনুশীলনে। আর এরই মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে পৃথিবীর উন্নত থেকে পিছিয়ে পড়া দেশগুলো স্বীকার করে নিল ভারতীয় সংস্কৃতির সার্বজনীনতা।

তবে এর কৃতিত্ব মোদীজীর একার নয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সফল করে তুলতে, দেশ-বিদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতে এর দায়িত্ব নিয়েছিলেন

ড. নাগেন্দ্র

স্বামী মহেশানন্দ

স্বামী নিরাঞ্জনানন্দ

অভিজিতা আয়েঙ্গার

বেশ কয়েকজন যোগগুরু যাঁরা আড়ালে থেকে, মিডিয়ার খ্যাতির আলোক থেকে দূরে অবস্থান করে নীরবে কাজ করে গেছেন। এঁদের মধ্যে বাবা রামদেব, শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেও অনুল্লেখ্য যোগাচার্যরা আড়ালেই রয়ে গেছেন। এই নেপথ্যে থাকা আচার্যদের মধ্যে প্রবীণতার দিক থেকে সর্বাগ্রে উল্লেখনীয় হলেন এইচ. আর. নাগেন্দ্র। ১৯৮০ সালে মোদীজী যখন সঙ্ঘের প্রচারক, তখন থেকেই তাঁর যোগশিক্ষার শুরু তাঁর কাছে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া নাগেন্দ্রজী নাসার মহাকাশ বিজ্ঞানীও ছিলেন। প্রাচ্যের দর্শন ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সমন্বয়ে সৃষ্ট স্বামী বিবেকানন্দের যোগশিক্ষার দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে যোগচর্চা শুরু করেছিলেন। এছাড়াও ব্যাঙ্গালুরুতে 'স্বামী বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থান' প্রতিষ্ঠাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সংস্থাটি স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্য কার্যগুলির অনুবাদ প্রচার করে থাকে। যোগগুরু নাগেন্দ্রজীর যোগ পদ্ধতি অন্যদের থেকে কিছুটা হলেও পৃথক। কারণ তিনি প্রতিটি মানুষের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে, সেই অনুযায়ী যোগশিক্ষা দেন। যাতে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়।

দ্বিতীয় প্রবীণ যোগগুরু হলেন ৬৩ বছর বয়সী স্বামী মহেশানন্দ। ১৯২৪ সালে পুনেতে স্বামী কুবালয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'দ্য কৈবল্যধাম যোগ ইনস্টিটিউট'-এর সঙ্গে ইনি যুক্ত। এখানে Art of living এবং Science of experience এর উপর ভিত্তি করে পতঞ্জলি যোগসূত্র অনুসৃত হয়। স্বামী মহেশানন্দ এই প্রতিষ্ঠানের একজন সর্বত্যাগী আধ্যাত্মিক গুরু। স্বাধ্যায় পর্বে বহু শিক্ষার্থী স্বামীজীর যোগশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

এরপরই উল্লেখনীয় একাধারে সন্ন্যাসী ও সমাজসেবী সদগুরু যজ্ঞি বাসুদেব (৫৮)।

আজ থেকে তেত্রিশ বছর পূর্বে একটি ঘটনা ব্যবসা কার্যে লিপ্ত পঁচিশ বছরের যুবক বাসুদেবের জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেয়। সেসময়ে দৈবক্রমে একদিন চামুণ্ডা পাহাড়ের উপর এক উজ্জ্বল আলোকপাত দেখেন তিনি। আর তারপরই ঘর সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস। ১৯৮৩ সালে মাত্র সাতজনকে নিয়ে তিনি শুরু করেন তাঁর প্রথম যোগ ক্লাস। সেই যে শুরু, তারপর এতগুলো বছর পেরিয়েও ক্রমবিকশিত ঈশ যোগ সেন্টার। যোগকে কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম সম্ভূত বলে দাবি করলেও যে কোনো ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে যোগ শিক্ষাদানে ছুঁৎমার্গ না থাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষজনও তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকর্ষিত হয়। তবে শুধু অধ্যাত্মচর্চা বা যোগ নয়, পরিবেশ ও সমাজ সংক্রান্ত বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন তিনি। তাঁর নিজস্ব গ্রীন হ্যান্ডস প্রোজেক্টের মাধ্যমে তামিলনাড়ুতে গত বারো বছরে প্রায় ২৫ মিলিয়ন গাছ লাগিয়েছেন যাতে দূষণে আচ্ছন্ন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কিছু পরিমাণে হলেও শুদ্ধতার ছোঁয়া লাগে। এছাড়াও

অ্যাকশন ফর রুরাল রিজুভিনেশনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে গিয়ে কাজ করছে ঈশ ফাউন্ডেশন। শিক্ষা যেহেতু সমাজের ভিত্তি, তাই ঈশ বিদ্যালয় শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সাতটি বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। এছাড়াও ছাব্বিশটি সরকারি বিদ্যালয়কেও গ্রহণ করেছে আরও উন্নয়নের স্বার্থে। এই ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন যোগী বহু উন্নয়নমূলক কাজ করা সত্ত্বেও নিজেকে একজন শেরপা বলে ভাবতে পচ্ছন্দ করেন। দুর্গম অঞ্চলে শেরপারা যেরকম মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, ঠিক সেইভাবেই মানুষকে মানসিক দোদুল্যমান পরিস্থিতিতে চিন্তাভাবনার সঠিক স্তরে পৌঁছতে পথ দেখান তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর উদ্যোগে আয়োজিত যোগ দিবস উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে তিনি মনে করেন যুব সম্প্রদায়ের যোগর্চ্চার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ভারতবর্ষ একদিন শক্তিশালী দেশে পরিণত হবে।

যোগদিবসের নেপথ্যে থাকা প্রথম সারির যোগগুরুদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। ১৯৬০ সালে ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁওতে তাঁর জন্ম। ৫৫ বছর বয়সী এই যোগী মাত্র চার বছর বয়সে মুঙ্গেরের বিহার স্কুল অফ যোগ-এ তাঁর গুরু স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর কাছ থেকে যৌগিক ও আধ্যাত্মিক বিদ্যা প্রাপ্ত হন। খুব ছোটোবেলাতেই তিনি যোগনিদ্রা শিখেছিলেন। ১৯৭১ সালে সৎনামী সন্ন্যাসে দীক্ষিত হওয়ার পর এগারো বছর বিদেশে কাটিয়ে ১৯৮৩ সালে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং যোগ বিদ্যালয়ের পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৯০-১৯৯৫ সালের মধ্যে তিনি পরমহংস সন্ন্যাসে দীক্ষিত হয়ে স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর উত্তরাধিকারী রূপে ঘোষিত হন। ১৯৯৪ সালে যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিহার যোগ ভারতী এবং ২০০০ সালে মুঙ্গেরে যোগ পাবলিকেশন ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ১৯৯৫ সালে তিনি শিশু যোগ বিপ্লব তথা যোগ মিত্র মণ্ডল স্থাপনেও উদ্যোগী হয়েছিলেন।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই যে যোগপথে বিচরণ করে সকলের গুরু হয়ে উঠতে পারে তা নয়, গৃহীরাও যে এই পথের পথিক হতে পারে তার নিদর্শন আমাদের সামনে রেখেছেন কৃষ্ণ রেড্ডি। কৃষক পরিবারের সন্তান কৃষ্ণ রেড্ডিই হলেন বর্তমানে কানাডা এবং ভারতবর্ষের যোগগুরু আচার্য প্রহ্লাদ (৪৯)। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি কেরলের নৈয়ারে শিবানন্দ আশ্রমে তাঁর দাদার প্রেরণায় টিচার্স ট্রেনিং কোর্স করতে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল শিবানন্দ যোগ বেদান্ত সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর জীবনকে আমূল বদলে দেয়। প্রথম দর্শনেই শিবানন্দ আশ্রমের সুন্দর ধ্যানমগ্ন পরিবেশ কিশোর কৃষ্ণকে এক আধ্যাত্মিক মুগ্ধতায় ভরিয়ে দেয়। কর্মযোগী দেবানন্দের মানবধর্মই রেড্ডিকে মূলত তাঁর দিকে আকর্ষিত করে। তারপর ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ন' বছর গুরুদেবের প্রয়াণ পর্যন্ত তিনি তাঁর ছায়াসঙ্গী হিসাবেই ছিলেন।

এরপর স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দের অসমাপ্ত কাজকে আরোও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পাশ্চাত্যে পাড়ি জমান। ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সী আচার্য প্রহ্লাদ আশ্রমিক সরস্বতীর সঙ্গে পরবর্তীকালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দুই পুত্র-কন্যা-সহ সপরিবারে বর্তমানে কানাডার কুইবেকে থাকলেও মাতৃভূমিকে তিনি ভোলেননি। তাই এই দুই দেশেই সমানতালে প্রচার করে চলেছেন যোগ মহিমা।

সর্বকনিষ্ঠ উদীয়মান যোগাচার্যা হলেন একত্রিশ বছর বয়সী অভিজাতা আয়েঙ্গার (৩১)। তিনি বি কে এস আয়েঙ্গারের উত্তরসূরী। ২০১৪ সালে পঁচানব্বই বছর বয়সে দেহত্যাগ করলেও বহু গুণগ্রাহী এখনও তাঁর যোগধারা অনুসরণ করে তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনকে আলোকিত করে চলেছেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি যোগপথে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁর অবর্তমানে যথাক্রমে পুত্র ও কন্যা প্রশান্ত ও গীতা-সহ নাতনি অভিজাতা রামমণি আয়েঙ্গার মেমোরিয়াল যোগ ইনস্টিটিউটের সর্বাগ্রবর্তী যোগশিক্ষক। বহু খ্যাত-অখ্যাত যোগগুরু, যোগ শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই ভারতবর্ষ-সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে যোগদিবস সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং ভারতও গিনেস বুক অফ রেকর্ড সে যোগচর্চার ক্ষেত্রে নিজের নাম তুলেছে। তাই যোগ সাফল্যে এদের সকলের উদ্যোগই অনস্বীকার্য।

এজেন্ট হওয়ার জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ৩০.০০ টাকা হিসাবে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের বকেয়া টাকা পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো যাবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমার টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

— ব্যবস্থাপক

চার্চের দেশ বৃটেনে কমছে আস্তিক, বাড়ছে নাস্তিক

তাজা সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, ইংল্যান্ডে খৃষ্টধর্ম দ্রুত লোপ পেতে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে শুরু করেছে।

অতিথি কলম

মুজফ্ফর হোসেন

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মানুষ সর্বশক্তিমানরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যদিও কখনও কখনও কোনো কোনো শাসক নিজেকে স্বয়ং ঐশ্বরিক শক্তির

সমকক্ষ প্রমাণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। নিজেকে তাঁরা ঈশ্বর বলেননি, কিন্তু নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে জাহির করে নিজের শক্তি দর্শানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। জগৎসভায় যিনিই সাফল্যের চরমসীমায় পৌঁছেছেন তখনই তাঁর নিজের কথাকে ঈশ্বরের বাণীরূপে বিভূষিত করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেননি। যীশুকে তারা ঈশ্বরের পুত্র বলেই ক্ষান্ত থাকেনি, পোপকেও ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করেছে। পাশ্চাত্যজগতে চার্চের ক্ষমতাকে ঈশ্বরের ক্ষমতার সমকক্ষ মনে করা হয়েছে। সেখানে চার্চকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর সিঁড়ি বলা হয়েছে। এজন্য চার্চে যাওয়া সেখানের মানুষদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ধর্মে যখন মানুষের বিশ্বাস বেড়ে যায় তখন তাকে আস্থা বলা হয়। মানব সভ্যতায় যখন সমাজকে পথনির্দেশের প্রয়োজন অনুভূত হলো তখন ধর্মগ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেই ভিত্তিতেই শাসনকার্য সঞ্চালনের জন্য মানুষ আচার সংহিতা তৈরি করে নিয়েছে। অধিকাংশ নিয়মকানুনের উৎসই হলো পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি। এজন্য প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে ধর্মগ্রন্থ হাতে নিয়েই শপথ নেওয়া হয়। কিন্তু এক সময় এরকমও এসেছিল যখন ধর্ম, মত, পন্থের কারণে বিবাদ শুরু হলো তখন কোনো কোনো দেশ তার সুযোগ গ্রহণ করলো। অর্থাৎ ধর্ম, মত, পন্থ এবং প্রশাসনের নিয়মকানুনগুলো কোথাও না কোথাও জুড়ে দেওয়া হলো। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, এগুলির নামেই মানুষ মানুষের রক্ত বহাতে শুরু করে।

নিজের নিজের ধর্ম, মত, পন্থকে প্রতিপাদিত করতে তাদের ধর্মগুরু ও অনুসারীরা অন্য মত ও পন্থকে তীব্র ঘৃণা করতে শুরু করে। কেউ কেউ কোনো কোনো পয়গম্বরের কার্টুন তৈরি করে তাদের বিরোধীদের উপহাস করতে থাকে। কেউ কেউ সন্ত্রাসি সংগঠন তৈরি করে মানুষের রক্ত নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে। এজন্য সভ্য জগতের লোক ভাবতে শুরু করে যে, কেন এই মজহবগুলিকে দশ হাত মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া হচ্ছে না যারা মানুষকে শুধু ঘৃণা করতে শেখাচ্ছে? তাই বহু সচেতন মানুষ নিজের মত ও পন্থকেই অস্বীকার করেছে। এখন অসংখ্য লোক ভাবতে শুরু করেছেন যে, নিজের দেশের সংবিধান এমন তৈরি করতে যাতে ধর্ম, মত ও পন্থের কোনো স্থানই না থাকে। কেউ কেউ এই ভাবনার নাম দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম্।

পৃথিবীতে এমন এক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে যারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে নিজেদের নাস্তিক বলতে শুরু করেছে। এখন পরিস্থিতি এরকম তৈরি হয়েছে যে, পৃথিবী আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির ভাবনা ও দৃষ্টিকোণ ভিন্ন হতে পারে। আমরা এখানে কেবল সেই তথ্যের ওপর বিচার করবো যে, পৃথিবীতে এখন কত লোক ঈশ্বরের ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন, কত লোক বিশ্বাস করবেন এবং কত লোক নিজের মতো থাকতে ভালবাসেন?

এশিয়া মহাদেশ প্রায় সমস্ত বড় ধর্ম ও মত-পথের উৎপত্তিস্থল। এখানে আজও ধর্মগুরুদের শাসন কম। কিন্তু বিজ্ঞানের কর্মভূমি ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে আজ তাদের রিলিজিওন সমাপ্তির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। যে ইংল্যান্ডের ক্ষমতা-সূর্য কখনও অস্ত যেত না সেখানে আজ খৃষ্টধর্মের সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। এর শ্রেয় অথবা অশ্রেয় কাকে দেওয়া হবে তা তর্কের বিষয় হতে পারে কিন্তু এক তাজা সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ইংল্যান্ডে খৃষ্টধর্ম দ্রুত লোপ পেতে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে শুরু করেছে।

বৃটেনের সংবাদপত্রে চমকে দেবার মতো একটি সমীক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই সমীক্ষা অনুসারে বিগত কয়েক বছরে চার্চের ২০ লক্ষ অনুগামী কমেছে। তাঁরা চার্চ অব ইংল্যান্ডের অনুগামী ছিলেন। এই খৃষ্টানদের ওপরই চার্চের ক্ষমতা কায়েম ছিল। বিভিন্ন কারণে চার্চের ভক্তের সংখ্যা কমলেও সেখানে এখনও যীশুভক্তদের রমরমা। কিন্তু পৃথিবীতে নাস্তিকদের সংখ্যা যদি কোথাও খুব বেশি থাকে তবে তা ইংল্যান্ডেই।

ক্যাথলিক পন্থের বিরুদ্ধাচারণ করে ইংল্যান্ডেই উৎপন্ন হয় প্রোটেস্ট্যান্ট পন্থ। ক্যাথলিক পোপ প্রোটেস্টান্টদের ওপর ভয়ানক অত্যাচার শুরু করলে বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তি খৃষ্টধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। নাস্তিক ভাবনা প্রথম থেকেই ছিল, কিন্তু তার সংগঠিত রূপ ইল্যান্ডেই সর্বপ্রথম দেখা যায়। এই ভাবনায় বিরোধীরা ক্রমশ সংগঠিত হতে হতে চার্চের মতোই এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে যায়, যা আজ খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের আর একটি পন্থ তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্রোটেস্ট্যান্টরা পোপ ও পাদরিদের বিরোধিতা করলেও তাদের নাস্তিক বলা যেতে পারে না। ইংল্যান্ডেই শুধু নাস্তিক

> **বৃটেনে ৫৮.৪ শতাংশ জনসংখ্যা কখনও চার্চের কার্যক্রমে সামিল হয় না। মাত্র ১৩.১ শতাংশ লোকই সপ্তাহে একবার বা তার থেকে বেশি চার্চে প্রার্থনা করতে যায়। ৫৮ শতাংশ লোক চার্চের প্রতি উদাসীন এবং মাত্র ১২.৮ শতাংশ লোক চার্চে যায়।**
>
> *—বৃটিশ সোশ্যাল অ্যাটিটিউড সার্ভে-২০১৪*

আছে এমন নয়, বিশ্বের অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এতে সামিল। এই সংখ্যা মোট ৪৯ শতাংশ। অন্যভাবে বলতে গেলে পৃথিবীর অর্ধেক নাস্তিক লোক বৃটেনে বাস করেন।

১৯৮৩-তে ইংল্যান্ডে নাস্তিকদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ·২৮ কোটি ছিল। ২০১৪ সালে তা বেড়ে ২.৪৭ কোটি হয়ে যায়। 'দ্য নেশন' সংবাদপত্রের সমীক্ষা অনুসারে যুবা বৃটিশ নাগরিক খুবই কম চার্চের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। সংবাদপত্রটি পরিষ্কারভাবে লিখেছে যে, ইংল্যান্ডে খৃষ্টানদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। একথা যতখানি দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করছে তার থেকেও বেশি ভয়ের কথা হলো এখানে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। বিগত দিনের ঘটনার উল্লেখ করে সংবাদপত্রটি লিখছে যে, ১৯৮৩ সালে ইংল্যান্ডে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ·৬ শতাংশ ছিল, আর ২০১৪ সালে বেড়ে তা ৫ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। জনসংখ্যার হিসাব বলছে, ক্যাথলিক খৃষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধিই হয়নি। ইংল্যান্ডের সচেতন নাগরিকদের মত হলো, এখানে খৃষ্টানদের শ্রেণী যত খুশি বাড়ুক, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু অন্য কোনো মজহবের লোকেরা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে তা ইংল্যান্ডের পরম্পরা ও পরিচিতির বিরুদ্ধে হবে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বৃটেনও মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে খুবই চিন্তিত। মুসলমানদের কট্টরতা বিষয়ে দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করে কয়েকদিন আগে ইংল্যান্ডের খৃষ্টান পন্থের প্রধানরা একটি বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। পোপ গত ক্রিসমসের ভাষণে এ বিষয়ে দেশের নাগরিকদের সতর্ক করেছেন। লন্ডন টাইমস্ লিখেছে, ইংল্যান্ডে নাস্তিকদের সংখ্যা বাড়ছে এটা চিন্তার বিষয় নয়, আসল সমস্যা হলো ইংল্যান্ডে খুব দ্রুত বাড়ছে মুসলমান জনসংখ্যা যা উইপোকার মতো বৃটিশ পরম্পরাকে ভিতর থেকে ধ্বংস করতে শুরু করেছে। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফত বা মানিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফত স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফত টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপি আমাদের পাঠালে ভালো হয়। — ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

অন্য রকম

ডিজিটাল ভিলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মডেল ভিলেজ বা স্মার্ট ভিলেজের কথা সকলেরই জানা। যেখানে মিলবে সমস্ত আধুনিক পরিষেবা। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেই ভারতকে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'তে পরিণত করার কথা ঘোষণা করেন। দেশে ১০০টি স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার কথা বলেন। কিন্তু তার আগে গুজরাটের ভাদনগর থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আকোদরার মতো একটি ছোট্ট গ্রামকে 'ডিজিটাল ভিলেজ' হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। অনেক মডেল ভিলেজ বা স্মার্ট ভিলেজ গড়ে উঠলেও অত্যাধুনিক পরিষেবা সম্বলিত এটিই ভারতের প্রথম ডিজিটাল ভিলেজ।

উত্তর গুজরাটের একটি ছোট্ট গ্রাম আকোদরা। যে গ্রামে খাতা-কলমের ব্যবহার নেই বললেই চলে। কারণ এখানে অনলাইনেই সমস্ত কাজ হয়ে থাকে। মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে এই গ্রামে ইন্টারনেটের সুবিধা পাওয়া যায়। স্বভাবতই কাজও চটজলদি হয়। চালু রয়েছে মোবাইল ব্যাঙ্কিং পরিষেবাও। অ্যানড্রয়েড সম্বলিত স্মার্ট ফোনে মোবাইল ব্যাঙ্কিংয়ের অ্যাপস ডাউনলোড করে সেখান থেকেই লেনদেন করা হয়। মোবাইল ব্যাঙ্কিংয়ের জন্য যে অ্যাপস ব্যবহৃত হয় তা গুজরাটি ভাষায়। ফলে খুব সহজেই তা ব্যবহার করা সম্ভব। দেখা গেল গ্রামের এরকম এক মহিলাকে। যিনি মুদির দোকানে এসেছেন কোনো টাকা-পয়সা ছাড়াই। কিন্তু সঙ্গে আছে ব্যাঙ্কের ডেবিট কার্ডটি। তাই প্রয়োজনীয় মালপত্র নেওয়ার পর ব্যাগ থেকে ডেবিট কার্ড বের করে দ্রব্যমূল্য মেটালেন। শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নেই ডিজিটাল ভিলেজ স্কুলগুলিতেও রয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া।

স্কুলে উপস্থিতির হার নির্ণয় করতে খাতা-কলম ব্যবহার করলে ছাত্ররা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। তাই প্রতিটি শ্রেণীতে রয়েছে বায়োমেট্রিক মেশিন। যেখানে ছাত্ররা ক্লাসে এসেই হাতের বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে নিজেদের উপস্থিতি প্রমাণ করে। বর্তমানে এই ব্যবস্থা ভারতের সমস্ত রাজ্যের সরকারি বেসরকারি কর্মস্থলগুলিতে থাকলেও স্কুলে এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু গুজরাটের এই গ্রামের স্কুলটিতে তা বহুদিন ধরেই চলে আসছে। বায়োমেট্রিক মেশিন হওয়ার পাশাপাশি ক্লাসরুমগুলিতে ব্যবহার হয় ডিজিটাল বোর্ড। এই বোর্ড ব্যবহারের সুবিধা হলো অভিভাবকগণ বাড়ি বা কর্মস্থল থেকে সহজেই তাঁদের সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারেন। এ বিষয়ে আকোদরা গ্রামের প্রধান তারাবেন জানান, ছাত্ররা ট্যাবলেট ব্যবহার করে এবং বইপত্র ডিজিটালি একে অপরের সঙ্গে আদানপ্রদান করতে পারে। আকোদরা গ্রামকে দেখলে ভাবতে হয় দেশের কোনো মেট্রো সিটিতে এই সমস্ত পরিষেবা একসঙ্গে পাওয়া যায় কিনা!

এই ডিজিটাল গ্রামের আধুনিকতার শেষ নেই।

গ্রামে প্রবেশ করা মাত্রই পকেটে যদি স্মার্ট ফোন থাকে তাহলে তা সঙ্গে সঙ্গেই কেঁপে উঠবে। কারণ আপনার ফোনে থাকা ওয়াইফাই গ্রামের ওয়াইফাই পরিষেবার সঙ্গে সংযোগ হতে চায়। আকোদরা গ্রাম আমেদাবাদ শহর থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ১১০০ জনসংখ্যার মধ্যে ২০০ জন এই পরিষেবা উপভোগ করে। ১৮ বছর বয়সী প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। গুজরাটের এই গ্রামে কৃষি বাজার অর্থাৎ স্থানীয় ভাষায় যাকে মান্ডি বলে সেটিও রয়েছে। তবে পণ্য বিক্রির আগে চাষিরা অন্যান্য মান্ডিগুলিও ঘুরে দেখে নেন কোথায় কী দাম চলছে।

এই গ্রামের আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো সেখানকার পশু হস্টেল। যেটি ভারতের প্রথম পশু হোস্টেল হিসাবে পরিচিত। গ্রামে পা রাখলেই বোঝা যাবে স্বচ্ছতা কী জিনিস। কারণ ঝকঝকে তকতকে এই আকোদরা গ্রাম দেশের প্রধান এটি গ্রাম হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। যে গ্রাম এতরকম বিজ্ঞানের বৈচিত্র্যে ভরপুর সেই গ্রাম দেশের ডিজিটাল গ্রাম হিসাবে বিবেচিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। শিল্প, কৃষি, গ্রামোন্নয়ন সব কিছুতেই গুজরাট সর্বপ্রথম। তাই এটা বলা যেতেই পারে উন্নয়নে গুজরাট আজ যা ভাবে অন্য রাজ্য কাল তা ভাববে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

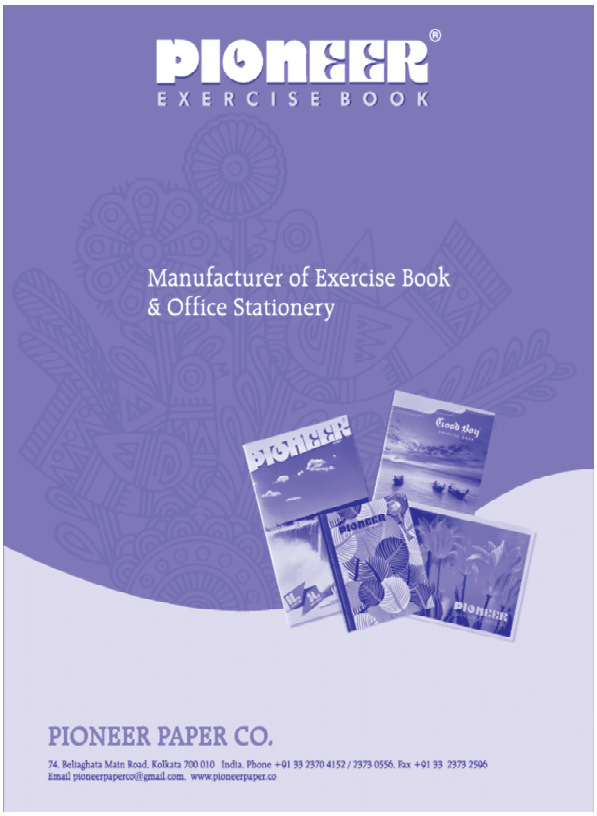

'সতী চরিত্রের নির্ভীকতায়, সর্বপ্রকার আত্মবিলুপ্তির ভিতরে আমরা নারী চরিত্রের মহিমা বিষয়ে ভারতীয় ধারণার কী অপূর্ব সাক্ষ্যই না পাও! অন্যান্য দেশে লোকে ধর্মের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, জ্ঞানার্জনের জন্য বা অনুরূপ কোনো মহৎ কারণের জন্য যা করছে, ভারতীয় নারী অতি অনায়াসে তার সহস্র গুণ বেশি করেছে পতিগৃহের প্রতি প্রীতিমধুর প্রাণের টানে।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

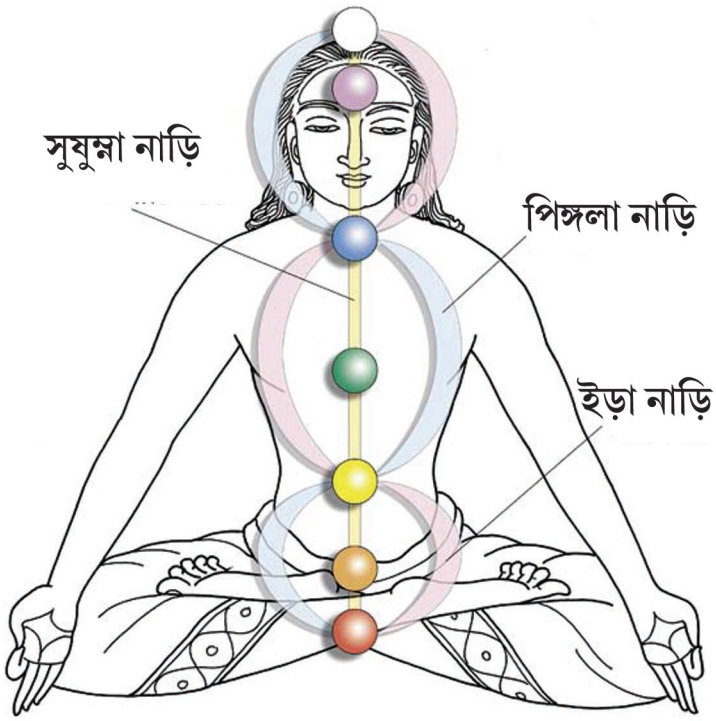

একটি ভারতীয় গুহ্যতত্ত্ব

স্বরোদয় যোগ

আশিস পাল

শ্বাস সম্বন্ধীয় সচেতন ক্রিয়াকে স্বরোদয় যোগ বলা হয়। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলে। শরীরে বায়ু গ্রহণ করলে তাকে প্রশ্বাস আর বায়ু শরীর থেকে ত্যাগ করলে নিঃশ্বাস বলে। এই নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস সাধারণত মানুষের দুই নাসারন্ধ্র দিয়ে হয়ে থাকে। বাম নাসারন্ধ্রে ইড়া নাড়ী (চন্দ্র), ডান নাসারন্ধ্রে পিঙ্গলা নাড়ী (সূর্য) এবং মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়ীর অবস্থান। মানুষের শরীরে ৭২,০০০ নাড়ী আছে। তার মধ্যে তিনটি নাড়ী প্রধান— ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না। প্রতি ১ ঘণ্টা অন্তর অন্তর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি পরিবর্তন হয়। মানুষ যদি এই গতি বুঝে চলতে পারে তা হলে বিশেষ উপকৃত হবে।

স্বরোদয় যোগের লক্ষ্য : শ্বাস প্রশ্বাসের উপর আধিপত্য বিস্তার ও ইড়া, পিঙ্গলার শ্বাস ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করে দেহকে চিরদিন ব্যাধিমুক্ত রাখতে পারা যায়। সুষুম্নার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা স্থাপিত হলে মনকে ইচ্ছামত একাগ্র করে ধ্যানের উচ্চ শিখরে পৌঁছনো সম্ভব। স্বরোদয় যোগের নিয়মে যাত্রার সময় নির্ধারিত করলে সব রকম দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এমনকী ঈপ্সিত পুত্র ও কন্যা লাভ করা যায়। এছাড়া আগে থেকে নিজের মৃত্যুর ক্ষণ জানা যায়।

যাত্রাপথ : ঘর থেকে বের হয়ে যাত্রা করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যখন যে নাসিকায় শ্বাস বইবে সেই দিকের পা আগে দিতে হবে, অর্থাৎ যদি বাম নাক দিয়ে শ্বাস প্রবাহ হয় তাহলে বাম পা আগে বাড়িয়ে ঘর থেকে বের হতে হবে। এই নিয়মে যাত্রা করলে যে উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয় সেই যাত্রার পূর্ণ সুফল পাওয়া যায়। যাত্রা শুভ হয়।

শোয়ার নিয়ম : দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে মাথা রেখে বাম নাসিকায় শ্বাস-প্রবাহের সময় শুতে হয়। ১/২ মিনিট চিৎ হয়ে শুয়ে তারপর বাম পার্শ্বে শুয়ে নাভিতে মনোনিবেশ করতে হয়। এইভাবে শুলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে এবং গভীর নিদ্রা হয়। বাম পার্শ্বে শয়ন করলে ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হবে। ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হলে হজম ভাল হয়। তার ফলে স্বাস্থ্যের উপকার হয়। ডান পাশে শুলে লিভারে চাপ পড়ে। ফলে হজমে ব্যাঘাত হয় এই জন্য বাম পাশে শুতে হয়।

শয্যা ত্যাগ : ভোরে ঘুম ভাঙার পর যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হবে সেই দিকের করতল মুখে রেখে শয্যা থেকে উঠতে হয়। তারপর শয্যা থেকে নামার সময় যে দিকে শ্বাস প্রবাহ হয় সেই দিকের শ্বাস ভিতরে প্রবেশকালে সেই পা আগে মাটিতে রাখতে হয়। এই ভাবে শয্যা ত্যাগ করলে সেদিনের সব কাজে সিদ্ধি লাভ হয়।

কার্য সিদ্ধির উপায় : যখন যেই নাকে শ্বাস প্রবাহিত হবে তখন আত্মীয়-বন্ধু, অফিসার, জমিদার, মালিক বা যে কোনো অভীষ্ট ব্যক্তিকে সেই পার্শ্বে রেখে দাঁড়িয়ে বা বসে কথাবার্তা বললে উদ্দেশ্য সফল হতে বাধ্য।

পুত্র ও কন্যা লাভ : রজো দর্শনের দিনটিকে প্রথমদিন রূপে গণ্য করতে হবে, সেইদিন বা পরের কয়েক দিন সময়কালে স্বামী ও স্ত্রী অবশ্য মিলন এড়িয়ে চলবেন, সেই সময় গর্ভ ধারণ করলে শারীরিক ও মানসিক বিকারগ্রস্ত শিশুর জন্মের সম্ভাবনা থাকে, অর্থাৎ বিকলাঙ্গ সন্তান

হবে।

পুত্র সন্তান হতে হলে : জোড়া সংখ্যা ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, কিংবা চতুর্দশ দিনে স্বামী ১৫ মিনিট ধরে স্ত্রীকে নিজের বাঁ দিকে রেখে শোবেন যাতে মিলনের আগে তিনি ডান নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস নেন।

কন্যা সন্তানের জন্য : বিজোড় সংখ্যা দিন গুলিতে অর্থাৎ ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩ বা ১৫ দিনের দিন স্বামী ১৫ মিনিট ধরে স্ত্রীকে তার ডানদিকে রেখে শোবেন যাতে মিলনের আগে তার বাম নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস নেন।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে মিলন যদি পরের দিকের তারিখগুলিতে ঘটে (১০ থেকে ১৫ দিন) সন্তান সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং সন্তান সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

আহার ও জলপান : আহারের সময় এবং আহারের পরে অন্তত আধ ঘণ্টা পর্যন্ত দক্ষিণ নাসিকা বা ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত রাখার ব্যবস্থা করলে অজীর্ণাদি পেটের যাবতীয় রোগ আরোগ্য হয়। বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহের সময় জল পান করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি দোহা :

'জো দোহিনে পানি পিয়ে ভোজন বাঁয়ে খায়,

দশ বারোদিন দিন খোঁ করে রোগ-শরীরহি আয়।'

অর্থাৎ যে ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত সময় জল পান করে ও বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত সময় অন্নাদি খায়, দশ বারো দিন এরূপ করলে রোগ হবেই।

মূল-মূত্র ত্যাগ : ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহের সময় পায়খানা করতে হয়, তাতে পেট পরিষ্কার হয়। সাধারণত পায়খানা করার সময় প্রস্রাব হয়ে থাকে, সেই সময় ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হলে কোনো দোষ হয় না।

কিন্তু অন্য সময় প্রস্রাব করার সময় বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহে করতে হয় এটি নিয়ম, নাসিকায় শ্বাস প্রবাহের সময় প্রস্রাব করলে শুক্রক্ষরণ হয় এবং শরীর দুর্বল হয়ে যাবে।

অধ্যয়ন : সুখাসনে অর্থাৎ সোজা যে কোনো আসনে জ্ঞান মুদ্রায় বসে পড়া উচিত। ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহের সময় ছাত্রছাত্রীরা যদি পড়াশোনা করে তাহলে বইয়ের বিষয়বস্তু ভালো ভাবে মুখস্থ হয় এবং দীর্ঘ দিন মনে থাকে। বাঁ-নাসিকায় শ্বাস প্রবাহের সময় পড়াশোনা করলে মুখস্থ হতে বহু সময় লাগে। মুখস্থ হলেও অল্পদিনে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা। ছাত্রছাত্রী কয়েকদিন লক্ষ্য করলেই এ বিষয়ে সত্যতা উপলব্ধি হবে।

শ্বাস পরিবর্তনের কৌশল : অনেক সময় মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে বা ইচ্ছা অনুসারে শ্বাস পরিবর্তন কৌশল প্রয়োজন হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে কীভাবে শ্বাস পরিবর্তন করা হবে তার বর্ণনা দেওয়া হলো—

(১) যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত থাকে তার বিপরীত নাসিকা বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা চেপে ধরে যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে সেই নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করবেন পরে সেই নাসিকা চেপে ধরে বিপরীত নাসিকা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করবেন। এই রকম পর পর কয়েক বার করলে শ্বাস পরিবর্তন হবে।

(২) যে নাসিকার শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে সেই বগলে একটি বালিশ দিয়ে সেই পার্শ্বে ১/২ মিনিট শুয়ে থাকলে খুব কম সময়ে শ্বাসের গতি পরিবর্তন হয়ে থাকে।

(৩) যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে শুধু সেই পার্শ্বে কাত হয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেও শ্বাসের গতি পরিবর্তন হয়ে থাকে।

ভালো ভাবে প্রক্রিয়াগুলি নিজ জীবনে প্রয়োগ করলে মানুষ বিশেষ উপকৃত হবেন। ■

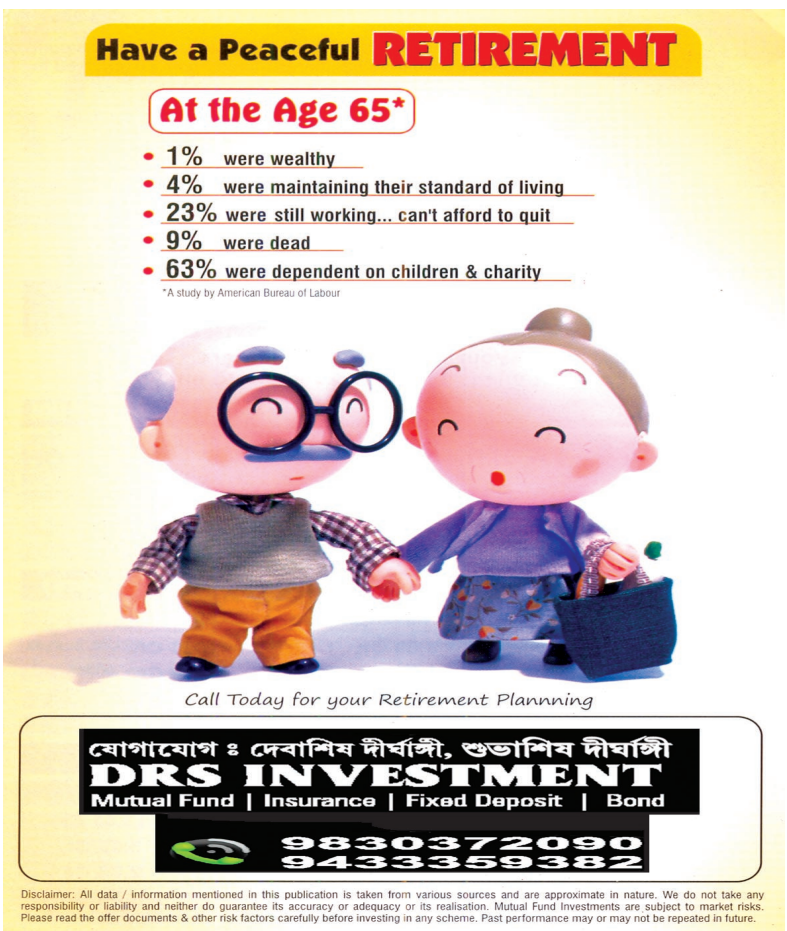

পুরাতন মালদায় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিবির

গত ১১ থেকে ২৩ জুলাই সকাল পর্যন্ত রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পুরাতন মালদা নগর ও খণ্ডের ৩ দিন ব্যাপী গ্রীষ্মকালীন শিবির মালদা জেলার বামাচারী গভর্নমেন্ট কলোনীর বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ২৯ জন, স্নাতক বর্ষের ৩ জন, অন্য ১০ জন শিক্ষার্থী বোন-সহ ৪ জন শিক্ষিকা ও ৭ জন প্রবন্ধিকা নিয়ে সর্বমোট ৫৫ জন এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। শিবিরের কার্যবাহিকা ছিলেন শ্রীমতী ইতি হালদার, মুখ্যশিক্ষিকা শ্রীমতী জ্যোৎস্না সাহা এবং বর্গাধিকারিণী ছিলেন শ্রীমতী রুবী দাস। এছাড়া স্থানীয় শিক্ষিকা শ্রীমতী জবা স্বর্ণকার, রত্না নন্দী, অন্তরাদি, বীণা ঘোষ প্রমুখ শিক্ষার্থী বোনদের কাছে প্রেরণাদায়ী বক্তব্য রাখেন। অভিভাবকরা চাল, ডাল, সব্জি এবং অন্যান্য জিনিস দিয়ে এই শিবিরে সহযোগিতা করেন। প্রভাত এবং সায়ম্ শাখায় বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন নিযুদ্ধ, ব্যায়াম যোগ, যোগাসন, সমতা ও খেলা হয়। শ্রীমতী তন্দ্রা শিক্ষার্থী বোনদের দেশাত্মবোধক গান শেখান। শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিশুমন্দিরের সদস্যা শ্রীমতী কাজল ভট্টাচার্য। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ভজন, পুতুল নাচ ও ছায়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

সমাবেশ সমাচার

নেতাজীনগর নারকেল বাগানে রক্তদান শিবির

গত ৫ জুলাই ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১১৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির কলকাতার ৯৮ নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবির ও জনসভার আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরে স্থানীয় বহু অধিবাসী উৎসাহের সঙ্গে রক্তদান করে সমাজসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ৬ জুলাই অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন সনাতন প্রামাণিক। প্রধান বক্তা রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদের অবদান এবং বর্তমানে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করেন। সভায় প্রভূত জনসমাগম হয়। সভার আহ্বায়ক ছিলেন অসীম চক্রবর্তী ও স্বপন পাল। সভাটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অরুণ রায়চৌধুরী। সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন রাজা বর্ধন, উত্তম গাঙ্গুলি, রামাশিষ শর্মা, ধ্রুব মুখার্জী, সুশান্ত রায়, তাপস মজুমদার প্রমুখ।

গত ১৯ জুলাই বিধাননগর শ্যামপ্রসাদ স্মৃতি সমিতির পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিতকে শ্যামাপ্রসাদ সম্মান ও সেইসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের আবক্ষমূর্তি দান করছেন সাংসদ মুরলীমনোহর যোশী। উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

গত ৪ জুলাই দুর্গাপুর সেবা বিভাগের পরিচালনায় এ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের এবং তাদের মায়েদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় ইছাপুর পঞ্চায়েত ভবনে। ওই অনুষ্ঠানে সেবা বিভাগ পরিচালিত সেবা কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্রছাত্রীদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়। উল্লেখ্য, সঙ্ঘের সেবা বিভাগের প্রচেষ্টায় ইছাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাবলম্বনের উপর মোট ১৮টি প্রকল্প চলছে দীর্ঘদিন ধরে। শিশু সংস্কার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রবেশ, তারপর পাঠদান এবং বিশেষ পাঠদানের দ্বারা তাদের শিক্ষিত করা হয়। এরকমই প্রায় ৩৪ জন ছাত্রছাত্রীকে ইছাপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ সরকার গলায় পদক পরিয়ে দেন এবং শংসাপত্র প্রদান করেন স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কাকলি চ্যাটার্জী। শিশুর নির্মাণে মায়েদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই মায়েদের বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানান বর্ধমান বিভাগ কার্যবাহ ড. কমল ভট্টাচার্য। সমাজ সেবা ভারতীর পক্ষে প্রদ্যুৎমল বসু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পুরীর রথযাত্রায় স্বয়ংসেবকদের সেবাকাজ

ওড়িশার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগ উৎকল বিপন্ন সহায়তা সমিতির উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও পুরীতে নবকলেবর রথযাত্রা দর্শনে আগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর জন্য ন' প্রকারের সেবাকাজ পরিচালনা করেন স্বয়ংসেবকরা। এই জন্য ভুবনেশ্বর থেকে পুরীতে চারটি অ্যাম্বুলেন্স আনা হয়। সেবা কাজের সূচনা করেন এসইউএম হসপিটালের সুপারিন্টেনডেন্ট ডাঃ প্রসন্ন কুমার মহান্তি। উপস্থিত ছিলেন উৎকল বিপন্ন সহায়তা সমিতির অধ্যক্ষ প্রকাশ বেতালা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেব সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ সেবা প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, ক্ষেত্র প্রচারক প্রদীপ যোশী, ক্ষেত্র কার্যবাহ গোপাল প্রসাদ মহাপাত্র, ক্ষেত্র প্রচারক প্রমুখ জগদীশ প্রসাদ খাড়েঙ্গা প্রমুখ। চারটি স্থানে চিকিৎসা বিভাগ, ১৬ স্থানে জলদান কেন্দ্র, ১২ স্থানে রাস্তার নিশানা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। দু' হাজারের বেশি স্বয়ংসেবক ওড়িশা ও ওড়িশা সংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে সেবাকাজে অংশগ্রহণ করেন।

মালদার কলিগ্রামে রথযাত্রা

প্রতি বছরের মতো এবারও মালদা জেলার কলিগ্রামে মহাধুমধাম সহকারে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। কলিগ্রাম শ্যামরাই মন্দির থেকে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথ অগণিত ভক্তের সঙ্গে কলিগ্রাম শিব মন্দির প্রাঙ্গণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেখানে বৈকাল ৬টায় পৌঁছায়। ভক্তগণ খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। এবারে কলিগ্রামের রথযাত্রার তৃতীয় বর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। আগামী ২৬ জুলাই উল্টোরথ উদ্‌যাপিত হবে।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ঝাড়গ্রাম জেলার মানিকপাড়া খণ্ড প্রচারক ধনঞ্জয় বাউরীর বাবা গত ১১ জুলাই পুরুলিয়া জেলার চেপড়া গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

বীরভূম জেলার তারাপুর শাখার স্বয়ংসেবক প্রভাত কুমার ঘোষের বাবা সত্যনারায়ণ ঘোষ গত ১৫ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি নাতনি রেখে গেছেন।

***

বীরভূম জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নলহাটি মহকুমার সহ-কার্যবাহ ভোলানাথ চ্যাটার্জির বাবা অনিল চ্যাটার্জি গত ১৩ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি নাতনি রেখে গেছেন।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ঝাড়গ্রাম জেলার বিরামডি গ্রামের স্বয়ংসেবক জ্যোতিষ মাহাতোর বাবা সন্তোষ কুমার মাহাতো গত ৪ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ির পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্ত্রী ভক্তিলতা দাশমহাপাত্র গত ৪ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

গত ৬ জুলাই বাঁকুড়া জেলা প্রচারক ভীষ্মদেব মণ্ডলের কাকা নিশাকর মণ্ডল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর বীরভূম জেলার বেড়া শিমুল গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ১ কন্যা, ভাইপো-ভাইঝি ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

আশাভঙ্গের অ্যান্টেয়ার্প

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিরের শহরে হীরকদ্যুতি দেখা গেল না ভারতীয় হকি দলের খেলায়। বেলজিয়ামের বাণিজ্যনগরী অ্যান্টেয়ার্প যা কিনা হিরে উৎপাদনের জন্যও বিখ্যাত সেখানে বিশ্ব হকি লিগ টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে মুখ লুকিয়ে এল সর্দার সিংহের দল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৬-২, গ্রেট বৃটেনের কাছে ৪-২ আর বেলজিয়ামের মতো হকি বিশ্বে মধ্যম শ্রেণীর দলের বিরুদ্ধেও ৫-২ গোলে হার ৯০ দশকের সেই অন্ধকার দিনগুলির কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। যে সময় বিশ্বকাপ বা অলিম্পিকের প্রায় সব দেশের বিরুদ্ধে হেরে ১০ থেকে ১২ নম্বর স্থানে শেষ করত ভারত। এবারও যেন তারই পুনরাবৃত্তি দেখা গেল। কোনোক্রমে ফ্রান্স ও মালয়েশিয়াকে হারানো গেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হার প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু গ্রেট বৃটেন ও বেলজিয়ামের সঙ্গে যে এভাবে বিধ্বস্ত হতে হবে, তা দূরতম কল্পনাতেও ভাবা সম্ভব হয়নি।

ডাচ প্রশিক্ষক পলভ্যান হাসের কাছে এই টুর্নামেন্ট ছিল অগ্নিপরীক্ষা। তিনি যে টেরিওয়ালসের যোগ্য বিকল্প হতে পারেন, দেশের বড় বড় সংবাদপত্র এমনটাই দাবি করে গেছে। দীর্ঘদিন হল্যান্ডের মতো বিশ্বের অন্যতম সেরা দলের কোচিং স্টাফে ছিলেন। আধুনিক হকির সঙ্গে পরিচিত। সব ঘরানার সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে পারেন, এটাই তাঁর ইউএসপি। হকি ইন্ডিয়া ও সাই যখন তাকে টেরিওয়ালসের উত্তরসূরি হিসেবে নিয়োগ করে এদেশে নিয়ে আসে, এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন হকি ইন্ডিয়ার সচিব নরেন্দ্র বাত্রা। কিন্তু অ্যান্টেয়ার্পে তাঁর স্ট্র্যাটেজি, গেম প্ল্যানিং, ম্যান ম্যানেজমেন্ট সব কিছু ছন্নছাড়া লেগেছে। যদিও এই টুর্নামেন্টে রুপিন্দার পাল সিং এবং কে রঘুনাথ না থাকায় ডিপ ডিফেন্স যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই শেষ তিন ম্যাচে এতগুলো গোল হজম করতে হয়েছে ভারতকে।

কিন্তু মাঝমাঠ ও আক্রমণ বিভাগে মোটামুটি এই মুহূর্তে দেশের সেরা খেলোয়াড়রাই ছিলেন। অথচ কোনো খেলাতেই প্রত্যাশিত বোঝাপড়া ও ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায়নি। অধিনায়ক সরদার সিং যথাসাধ্য লড়েছেন। ফরোয়ার্ডে সুনীল, মননদ্বীপরা বিক্ষিপ্তভাবে জ্বলে উঠেছেন। গত বছর এশিয়ান গেমস তারপর অস্ট্রেলিয়া সফরে যে গতিতে ছন্দবদ্ধ হকি খেলেছিল সর্দারের টিম, তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি অ্যান্টেয়ার্পে। এক বছর পরে ব্রাজিলের রাজধানী রিওতে অনুষ্ঠিত হবে অলিম্পিয়ার্ড। এশিয়াডে সোনা জিতে সরাসরি অলিম্পিকে খেলার ছাড়পত্র জোগাড় করে নিয়েছে ভারত। তারপর থেকেই হকিকে ঘিরে পুরনো আবেগ, জাতীয়তাবোধের যেন পুনর্জাগরণ হয়। সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রক, হকি ইন্ডিয়া, মিডিয়া সবাই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে হকির সোনালি অতীত, গৌরবময় সব অধ্যায় ফিরিয়ে আনার জন্য তৎপরতা দেখাতে শুরু করে। অলিম্পিকে পদক আসতে পারে এমন যে সব খেলার তালিকা তৈরি হয়, তার মধ্যে তাতে হকিকে রাখা ও তার জন্য বিশেষ পরিকল্পনাও নেওয়া হয়।

তবে সেই প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বড় ধাক্কা যার কোচিংয়ে গত বছর ভারত বিভিন্ন টুর্নামেন্টে এত ভাল পারফরমেন্স করল সেই টেরিওয়ালসকে হাতছাড়া করা। আই হকি ইন্ডিয়ার দ্বন্দ্ব ও টেকনিকাল কিছু কারণে অস্ট্রেলিয়ান প্রশিক্ষকটি তিতিবিরক্ত হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো সদিচ্ছে বা উদ্যোগ কিছুই দেখা গেল না দেশের কর্তাব্যক্তিদের পক্ষে। অথচ প্রাক্তন বিশ্ব তারকা কোচ কিন্তু ভারতীয় দলকে হাতের তালুর মতো চিনে নিয়েছিলেন। মাঠ ও মাঠের বাইরে গোটা দলের ঐক্য মনোবল অটুট রেখে ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী ট্যাকটিক্স, স্ট্রাটেজি তৈরি করে বড় বড় মঞ্চে সাফল্য এনে দিয়েছিলেন। তার অভাবে এই ভারতীয় দলের খেলায় 'সুর-তাল-লয়' সব অদৃশ্য। মালয়েশিয়ার সুলতান আজলান শাহ টুর্নামেন্ট, অ্যান্টেয়ার্পের সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব হকি লিগ দু' ক্ষেত্রেই ভারতের যা ভূমিকা তারপর আর রিও অলিম্পিকে 'পোডিয়াম ফিনিশের' কথা ভাবা যাচ্ছে না। যদিও দু-তিনজন ভাল খেলোয়াড় পরে দলভুক্ত হবেন। যাদের এই টুর্নামেন্টে পাওয়া যায়নি। কিন্তু সন্দীপ সিং ও অপেক্ষাকৃত বয়স্ক রাজপাল সিংকে বাদ দিয়ে বড় ভুল করেছে হকি ইন্ডিয়া। অ্যাভিয়েন্স ও ফরোয়ার্ডে এই দু'জনকে যদি ফিরিয়ে আনা হয়, আখেরে লাভ বই ক্ষতি হবে না।

সরদার সিং

শব্দরূপ-৭৫৬ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

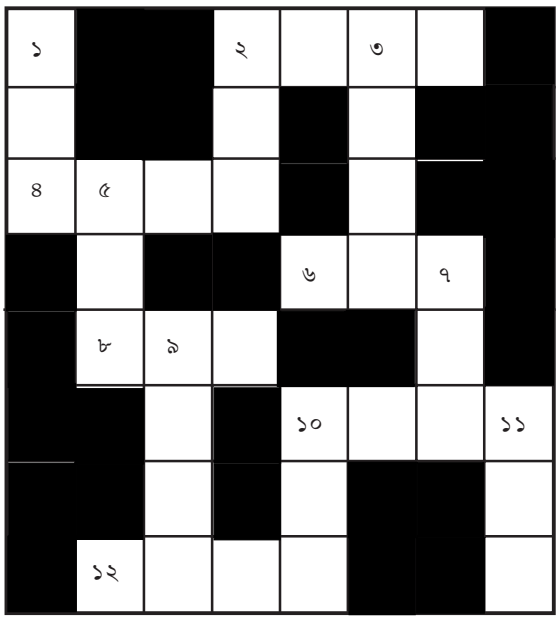

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. 'গোবরে—' (বাগ্‌ধারায়); তামরস, ৪. সার্বভৌম নরপতির যজ্ঞবিশেষ, ৬. সর্প, ৮. রাজহংস, ১০. মনসাদেবী; কর্ণপত্নী, ১২. ব্রহ্মা; প্রথম দুয়ে কমল।

উপর-নীচ : ১. কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ব্যাধ কালকেতুর পত্নী, ২. পালা, ক্রম, ৩. ফুঁ, ৫. 'সার্থক—মাগো, জন্মেছি এই দেশে', ৭. 'মোদের—, মোদের আশা/আমরি বাংলাভাষা', ৯. সূর্যমুখী ফুল, ১০. যে ভূসম্পত্তির উপর নির্ধারিত কর দিতে হয়, ১১. ব্যাধ শ্রেণীর একটি জাতি।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৫৩
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	খ	তি	■	ষ	ড়	জ	■
■	টা	ল	■	ড়া	■	ড়	■
আ	শ	ং	স	ন	■	মা	জা
শ	■	■	■	ন	জ	রা	না
কা	ল	পেঁ	চা	■	■	■	লা
রা	য়	■	রু	চি	বি	কা	র
■	কা	■	ল	■	তা	লি	■
■	রি	ক্ত	তা	■	ন	ন্দী	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৫৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৭ আগস্ট ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

SURYA

Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com

Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

ARE YOU SEARCHING FOR A PROPERTY PLANNER ?

PROPERTY

BUY SALE RENT

Contact

DILIP KUMAR JHAWAR 9831172945

RANAJIT MAZUMDAR 9339861465

S M WEALTH INFRAREALTOR LLP | 52 /E BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA 700019
Email : info@smwealth.co | Web Link : www.smwealth.co

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
27 July - 2015 - Rs. 10.00